বিনিময় ২০ টাকা

অধিকার

বিশেষ লক-ডাউন সংখ্যা (জুন-জুলাই-আগস্ট, ২০২০)

এই সংখ্যার বিষয়

সম্পাদকীয়
মাটিতেই লেখা থাকে
'পিঞ্জরে বিহঙ্গ বাঁধা': তখন যেমন এখন তেমন...
লকডাউনের পর- আমাদের হিসেব নেওয়ার পালা
প্রতিবাদী মেয়েদের ডবল লকডাউন চলছে
নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০- বিক্রির তালিকায় এবার গোটা শিক্ষাব্যবস্থা
কেন আমরা এনআরসি-সিএএ-এনপিআর বিরোধী
ভারভারা রাও
তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদন
সংগঠন সংবাদ

সম্পাদনা: পত্রিকা উপসমতি। গণতান্ত্রিক অধিকাররক্ষা সমিতির পক্ষে সাধারণ সম্পাদক ধীরাজ সেনগুপ্ত (8981416511) কর্তৃক প্রকাশিত ও কলাভবন, কলকাতা থেকে মুদ্রিত।

E-mail : apdr.wb@gmail.com
Website : www.apdrwb.in

সমালোচনার অধিকার না থাকলে গণতন্ত্র থাকবে না

লকডাউনের বাজারে কোলাহল তো এমনিতেই বারণ। জমায়েত চলবে না, মিটিং-মিছিল চলবে না, কারণ 'সামাজিক দূরত্ব' বজায় রাখতে হবে। কিন্তু তাতেও রক্ষে নেই। কেউ একা একা নিজের মত প্রকাশ করলেও মুশকিল হতে পারে, যদি সেই মত শাসকদের বিরুদ্ধে যায়। তার ওপর আরেকটা দিকেও এখন সদা সতর্ক থাকতে হচ্ছে, তা হল, শুধু সরকার নয়, আদালত না আবার কোনও কথায় অপমানিত বোধ করে বসে।

আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা করেছে সুপ্রিম কোর্ট, এবং তাঁকে দোষী সাব্যস্তও করেছে। এই মামলার উপলক্ষ ছিল প্রশান্তের দুটি টুইট। কারও অভিযোগের ভিত্তিতে নয়, কোর্ট স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এই মামলা দায়ের করেছে এবং স্বয়ং প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ তার বিচার করেছে। প্রশান্ত ভূষণ দীর্ঘকাল ধরে ওই আদালতে প্র্যাকটিস করছেন। জনগণের অধিকারের প্রশ্ন যেখানেই জড়িত, সেখানেই তাঁকে দেখা গেছে পারিশ্রমিকের কথা না ভেবে নির্দ্বিধায় আইনি লড়াইয়ের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিতে। এপিডিআর-এর হয়ে সিঙ্গুরের জমিহারা কৃষকদের জমি ফেরানোর মামলায় তাঁর পরিচালনায় যে সাফল্য এসেছে, সেকথা সবাই জানেন। এখন যশোর রোডের হাজার হাজার ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন গাছ বাঁচানোর লড়াইও সুপ্রিম কোর্টে, এবং তা তিনিই লড়ছেন।

জনগণের অধিকারের বন্ধু এহেন একজন আইনজীবীর ওপর শাসনের খাঁড়া নেমে এলে তা জনগণের এবং আমাদের মত অধিকার সংগঠনগুলির ভাবনার বিষয় হয়ে দাঁড়ায় বই কি। তাই এই মামলার রায় ঘোষণার আগেই সারা দেশ থেকে সুপ্রিম কোর্টের কাছে মামলা প্রত্যাহার করার জন্য অনেক আবেদন গিয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গ থেকে যে আবেদনটি যায়, তাতে সই করেছিলেন বহু বরিষ্ঠ আইনজ্ঞ, শিক্ষা ও সংস্কৃতি জগতের উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব এবং অধিকার কর্মীরা। বোঝাই গেল, এসব আবেদন বিচারপতিদের গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়নি। তাঁরা তাঁদের রায়ে বললেন, "এই ধরনের

আক্রমণ যদি যথাযথ দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিহত করা না হয়, তবে তা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দেশের মান এবং মর্যাদার ক্ষতি করতে পারে। নির্ভিক ও নিরপেক্ষ বিচারালয়গুলি হল স্বাস্থ্যবান গণতন্ত্রের নিরাপত্তাবলয়, এবং তার ওপর কোনও বিদ্বেষপরায়ণ আক্রমণের মাধ্যমে তার প্রতি আস্থা টলিয়ে দেওয়া অনুমোদন করা যায় না।" (অনুবাদের অনিচ্ছাকৃত ত্রুটিবিচ্যুতি মার্জনীয়।)

এখানেই কিছু প্রশ্ন উঠে যায়। একটা মন্তব্য কি এতই জোরদার হওয়া সম্ভব, যে তা একেবারে জগৎসভায় দেশের আসন টলিয়ে দিতে পারে? আর আদালতগুলি যদি নির্ভিক ও নিরপেক্ষই হয়, তাহলে তো তাদের ওপর জনগণের আস্থা অবিচল থাকতে বাধ্য, যে যাই বলুক না কেন।

রায় বেরোনোর পর সারা দেশ থেকে বহু প্রাক্তন বিচারক সহ আইনব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত তিন হাজারেরও বেশি মানুষ এক বিবৃতিতে বলেছেন, "গণতন্ত্রে প্রতিটি সংস্থাকেই জনগণের কাছ থেকে ভালবাসা ও সম্মান অর্জন করে নিতে হয়, এবং প্রত্যেক শক্তসমর্থ সংস্থার বৈশিষ্ট্য হল জনগণের নজরদারি আর মন্তব্যের জন্য নিজেকে উন্মুক্ত রাখা। কেউ যদি বিচারবিভাগের কাজকর্ম সম্পর্কে সমালোচনামূলক মতামত ব্যক্ত করতে চান, এই রায় তাঁদের ওপর এক হিমশীতল প্রভাব ফেলবে। অংশীদারদের সমালোচনাকে রুদ্ধ করে দেওয়াটা কোনও সংস্থার পক্ষেই ভাল নয়, বিশেষ করে দেশের সর্বোচ্চ আদালতের পক্ষে তো নয়ই।"

ইংল্যান্ডে ১৯৮৭ সালে বিখ্যাত 'স্পাইক্যাচার' মামলায় তখনকার আপিল মামলার সর্বোচ্চ বিচারপতি 'ল লর্ড'-দের এক রায়ের প্রতিবাদে তিনজন ল লর্ড-এর ছবি উলটো করে ছেপেছিল ট্যাবলয়েড কাগজ 'ডেইলি মিরার'। তলায় লিখেছিল, "ইউ ওল্ড ফুলস" (তোমরা বোকা বুড়ো)। তার বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার দায়ে ব্যবস্থা নিতে অস্বীকার করে লর্ড টেম্পলটন বলেছিলেন, "আমি এটা অস্বীকার করতে পারি না যে আমি বুড়ো; এটা সত্যি। আমি বোকা কিনা তা অন্যদের ধারণার বিষয়... এখানে আদালত অবমাননা সংক্রান্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করবার কোনও দরকার নেই।"

আমাদের দেশের অন্যতম অধিকারবান্ধব বিচারপতি ভি আর কৃষ্ণ আইয়ার বলেছিলেন, "বিচারকদের নিজেদের মধ্যেই যদি পচন ধরে, আদালত অবমাননা সংক্রান্ত ক্ষমতা তাদের বাঁচাতে পারবে না।"

এসব কথা আমরা আর কি মনে করিয়ে দেবো, মহামান্যরা সবই তো জানেন। কেবল এইটুকু বলতে পারি যে জনগণ শাস্তির ভয়ে কোনও সংস্থাকেই সমালোচনার অধিকার ছাড়বে না। নাহলে গণতন্ত্র থাকবে না। জগৎসভায় এভাবে আমাদের মানসম্মান হারাতে আমরা চাই না।

যাঁদের হারালাম

অমিত মুহুরি : এপিডিআর সরাসরি সদস্য-সমন্বয় শাখার সদস্য অমিত মুহুরির জীবনাবসান হল অকালেই। মাস তিনেক আগে ঘুমের মধ্যে গুরুতর অসুস্থ হয়েছিলেন। অস্ত্রোপচারের পরবর্তী সময়ে দীর্ঘ দিন হাসপাতালেই ছিলেন। পুরোপুরি সেরে ওঠার আশা দিচ্ছিলেন না ডাক্তারবাবুরা। তবে চিরনিদ্রায় চলে যাবেন, তেমন আশঙ্কা আস্তে আস্তে কাটছিল। আচমকাই গত ১১ অগাস্ট সব শেষ। হাসপাতালেই করোনা-পজিটিভ হয়েছিলেন। তা থেকে সেরেও উঠেছিলেন। স্ত্রী-কন্যা রয়েছেন। অমিত মুহুরি ছিলেন তর্কপ্রিয়, নানা নতুন ভাবনায় সহকর্মীদের ভাবাতে পারতেন। লকডাউন-পর্বেও সরাসরি সদস্যদের একাধিক সাপ্তাহিক আলাপে অংশ নিয়েছেন। লিখেছেন 'অধিকার' পত্রিকায়। রেলের ইউনিয়নেও ছিলেন সক্রিয়।

ইলিনা সেন : সারা জীবন অনেক লড়াই করেছেন। ছত্তিসগড়ের শ্রমিক আর জনজাতীয়দের অধিকারের জন্য, নারীদের অধিকারের জন্য, সমস্ত মার-খাওয়া মানুষদের অধিকারের জন্য, জীবনসঙ্গী ডাঃ বিনায়ক সেন ও অন্যান্য রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্ত করার জন্য। ক্যান্সারের সঙ্গেও লড়ছিলেন বহুদিন ধরে। শেষপর্যন্ত চলে যেতে হল। গত ৯ অগাস্ট, ৬৯ বছর বয়সে। আমাদের জন্য রেখে গেলেন যে কোনও কঠিন পরিস্থিতিতেও সেই অনাবিল হাসি, আর আমাদের আন্দোলনের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন। ইলিনা সেন এভাবেই আমাদের মনে থেকে যাবেন।

জয়ন্ত সেন : গণ-আন্দোলনের দীর্ঘদিনের কর্মী, এপিডিআর-এর কাছের মানুষ জয়ন্ত সেন তিন বছরেরও বেশি সময় মৌড়িগ্রামের 'ইরিম' হাসপাতালের বাসিন্দা ছিলেন। ২১ অগাস্ট সকালবেলা চলে গেলেন। বয়স হয়েছিল আশির কোঠার ওপরের দিকে। এক সময় 'স্টেটসম্যান' পত্রিকায় সাংবাদিকতা করেছেন। তারপর কমিউনিস্ট বিপ্লবী আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেন। মাওবাদী কমিউনিস্ট কেন্দ্রের নির্মাতাদের একজন ছিলেন। পরবর্তীকালে সক্রিয় রাজনীতি থেকে সরে এলেও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার সংগ্রামে থেকে গিয়েছেন আজীবন। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম-লালগড় আন্দোলনের পর্যায়েও তিনি ছিলেন চেনামুখ। তাঁর অভিজ্ঞতাময় জীবনের গল্পের ঝুলি বহু কনিষ্ঠ কর্মীকে ঋদ্ধ করেছে।

মাটিতেই লেখা থাকে

স্বপ্না

সেই মানুষ –
রাষ্ট্র বেআইনি বানায়-
খোয়াব দেখে ক্রীতদাস বানাবার-
ক্ষমতা-
ধর্ম-
বন্দুক-
কাগুজে অজুহাত ...
সেই মানুষ-
যে-বেনাগরিক-
বে- ঘর-
এ দেশের হৃদয়।
ধমনীতে বহতারক্ত স্রোত-
পরম্পরায় ভুখা কৃষক –
ফসল ফলায় –
অকাতরে দেয় প্রাণ-
নিজভূমে পরবাসি হয়।
জং ধরা অস্ত্র শানায়-
দেগে দেয় অনুপ্রবেশকারী –
ঘরহারা সব হারা মজুর –
কারখানা লক-আউট –
বহুতল-
শপিংমল-
খাদান-
রক্তঘাম-
মুনাফার জোয়াল বয়।
এদেশের আকাশে-
ভিড় জমায় বহুজাতিক-
মানুষ মারার দল।
সেই মানুষ-
পিতৃতন্ত্রের শিকলে বাঁধা –
বেগার শ্রমে নুয়ে পড়া শরীর –
অমর্যাদায় –
মেয়ের যাপন –
তৃতীয় লিঙ্গ –
রূপান্তরকামী মেয়ে –
ঠাঁই মেলেনা কোথাও –
নাগরিক পঞ্জিকরণ –
দীপালি নমঃশুদ্র , হিনা –
হাজারো হাজরা বিবিরা-
অবৈধ- পরোয়ানা আসে –
ডিটেনশন ক্যাম্প।
ফুঁসতে থাকা মানুষ-
“ বেআইনি “
ঐকবদ্ধ হাত-
ছিঁড়ে ফেলে
কাগুজে প্রমাণ।
সেই মানুষ-
মাটির বুকে জন্মায় –
মাটি ছেনে ফসল ফলায় –
গাঁইতি চালায় –
ইঁটের পর ইঁট সাজায়-
মাটির কাছে শেখে –
বেঁচে থাকার বর্ণপরিচয় –
মাটিতেই লেখা থাকে মানুষের পরিচয়।

এপিডিআর চুঁচুড়া শাখার দুই সহযোদ্ধার জীবনাবসান হয়েছে।

শ্রী শ্রী ধর ভট্টাচার্য ১৩ ই জুলাই, ২০২০এবং শ্রী রবীন্দ্রনাথ সাহা গত ২৫শে জুলাই,২০২০ আনুমানিক ৮২ বছর বয়সে দীর্ঘ রোগভোগের পর জীবনাবসান হয়।

শ্রীধর ভট্টাচার্য্য ১৯৫২ সালে বাঁকুড়া জেলার খাতরায় জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে তার পরিবার কাজের সন্ধানে চুঁচুড়ায় চলে আসেন এবং এখানেই ছাত্র জীবন অতিবাহিত হয়।স্কুল জীবন থেকেই সাংসারিক দুরবস্থার মধ্যেও বামপন্থী ছাত্র আন্দোলন তাঁকে আকর্ষণ করেছিল। ষাট ও সত্তর দশকের উত্তাল ছাত্র-যুব-মধ্যবিত্ত আন্দোলনে সক্রিয় ভাবে যুক্ত ছিলেন। পরবর্তীকালে পেশায় স্কুল শিক্ষক ছিলেন এবং সারা জীবন মানুষের অধিকারের সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি এপিডিআর ছাড়াও আরও বেশ কিছু গণসংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। নাট্যাভিনয় এর প্রতি তাঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল। নাট্যজগতের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ সাহা প্রথম জীবনে তৎকালীন পূর্ববঙ্গের পাবনা জেলায় মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে বিভিন্ন আন্দোলন এবং ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ষাটের দশকে চুঁচুড়ায় চলে আসেন।ষাট ও সত্তর দশকের উত্তাল ছাত্র-যুব-মধ্যবিত্ত আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। আজীবন দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে মানুষের অধিকারের সংগ্রামে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত পাশে ছিলেন। ব্যক্তিগতভাবে তিনি ভাল তবলাবাদক ছিলেন এবং সাংস্কৃতিক জগতের ও একজন সক্রিয় কর্মী ছিলেন।

‘পিঞ্জরে বিহঙ্গ বাঁধা’: তখন যেমন এখন তেমন...

অপূর্ব রায়

‘ভূপেন যখন আদালতে সাফাই গাহিয়া আপনাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিল না, তখন দেশে ছোকরাদের মধ্যে একটা খুব হৈ চৈ পড়িয়া গেল। এ কাণ্ডটা নূতন আজগুবী কাণ্ড বটে।’

সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বিপ্লবীদের সাপ্তাহিক পত্রিকা ‘যুগান্তর’ সম্পাদনা ও বিপ্লবী ইস্তেহার ‘সোনার বাংলা’ প্রকাশের ‘অপরাধে’ ১৯০৭ সালে গ্রেপ্তার হন উত্তর কলকাতার সিমলার বাসিন্দা ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, তাঁর এক বছরের কারাদণ্ডও হয়; ভূপেন্দ্রনাথের গ্রেপ্তারির পরের ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে উদ্ধৃতাংশের কথাগুলো লিখেছেন উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁর ‘নির্বাসিতের আত্মকথা’য়। উপেন্দ্রনাথের লেখা থেকে বোঝা যায়, ভূপেন্দ্রনাথের আদালতে সাফাই গেয়ে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা না করা কিছুটা অন্যরকম খবর বলেই একটা ‘হৈ চৈ’-এর ব্যাপার হলেও রাজনৈতিক মতের জন্য শাসকের কারাগারে বন্দি হওয়ার খবরটা লোকের গা-সওয়াই হয়ে গিয়েছিল, ফলে ও নিয়ে তেমন হৈ-চৈ হয়নি। লেখক উপেন্দ্রনাথ নিজেও বিপ্লবী কর্মী হিসাবে ‘যুগান্তর’ এবং ‘বন্দেমাতরম’ পত্রিকায় যুক্ত ছিলেন, আলিপুরের বোমার মামলার আসামী হিসাবে যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত হয়ে আন্দামানের জেলে যান, ১৯০৯ সালে। ভূপেন্দ্রনাথ, উপেন্দ্রনাথরা নিজেদের বিপ্লবী রাজনৈতিক কাজকম্মের জন্য শাসকের রোষানলে পড়েন, বন্দি হন, শাসকের অপছন্দের রাজনীতি করার জন্য বন্দি, রাজনৈতিক কারণে বন্দি, তাই এরা রাজনৈতিক বন্দি বা সংক্ষেপে রাজবন্দি। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের জেলখানায় রাজনৈতিক কর্মীদের বন্দি করা আর রাজবন্দিদের উপর রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস চলছিলই। ১৯৩১ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর মেদিনীপুরের হিজলী বন্দিনিবাসে রাষ্ট্রীয় বাহিনী রাজবন্দিদের উপর হামলা চালায়, পুলিশের গুলিতে শহিদ হন মধ্য কলকাতার বৌবাজারের সন্তোষকুমার মিত্র এবং বরিশালের গৈলা গ্রামের তারকেশ্বর সেন, পুলিশের লাঠি-গুলিতে আহত হন বহু রাজবন্দি। হিজলী হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ২৬ সেপ্টেম্বর মনুমেন্টের পাদদেশে সভায় সভাপতিত্ব করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ডাঃ নীলরতন সরকার রাজনৈতিক বন্দিমুক্তির জন্য একটি নাগরিক কমিটি গঠনের প্রস্তাব রাখেন, রবীন্দ্রনাথকে সভাপতি করেই সে কমিটি তার কাজ শুরু করে। এরপরেও জেলে বন্দিহত্যা থেমে থাকেনি, পুলিশ হেফাজতে বন্দিহত্যা থেমে থাকেনি। ১৯৩২-এর ৬ জুন পুলিশ হেফাজতে খুন হন ঢাকার ২৬ বছর বয়সী বিপ্লবী কর্মী অনিলচন্দ্র দাশ, ১৯৩৪-এর ১৯ ডিসেম্বর রাজশাহির জেলে শহিদ হন তিন বছর ধরে বিনা বিচারে আটক ২৪ বছর বয়সী বিপ্লবী কর্মী সান্ত্বনা গুহ, ১৯৩৬-এর সেপ্টেম্বরে ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ থানার পুলিশ খুন করে মেদিনীপুরের শহিদ বিপ্লবী নবজীবন ঘোষের ভাই ২৪ বছরের নবজীবন (শালিখ) ঘোষকে। ১৯৩৩ সালের মে মাসে জোর করে নাকে নল দিয়ে খাইয়ে আন্দামানের সেলুলার জেলের রাজবন্দিদের অনশন আন্দোলন ভাঙার চেষ্টা চললে তিনজন রাজবন্দি শহিদ হন — মহাবীর সিং রাঠোর (শহিদ দিবস: ১৮ মে), মোহনকিশোর নমোদাস (শহিদ দিবস: ২৬ মে) মোহিত মৈত্র (শহিদ দিবস: ২৮ মে)। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে তখন বিভিন্ন ধারার রাজনৈতিক কর্মী, ফলে জেলের মধ্যেও নানা ধারার রাজনৈতিক বন্দি। ভারতে দুয়ের দশক থেকে বামপন্থী-সমাজতান্ত্রিক রাজনৈতিক কর্মীদের উত্থান, ১৯২৫ সালের ডিসেম্বরে ভারতে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (CPI)-এর প্রতিষ্ঠা, শ্রমিক-কৃষককে সংগঠিত করার জন্য বামপন্থীদের উদ্যোগে ইউনিয়ন গড়া হয়েছে আগেই, বেড়েছে রাষ্ট্রীয় নির্যাতন, জেলে ঢুকেছেন প্রথম পর্যায়ের কমিউনিস্ট সংগঠকরা, এবং তাদের মাধ্যমেই জেলে ঢুকলো মার্কসবাদী রাজনীতি। পুরোনো যুগের বিপ্লবী আন্দোলনের কর্মীরা অনেকেই জেল থেকে বেরিয়ে যোগ দিলেন কমিউনিস্ট পার্টিতে, অনেকে গেলেন অনুশীলন সমিতির বিপ্লবীদের সমাজতন্ত্রী অংশ এবং কংগ্রেস সমাজতন্ত্রীদের সমন্বয়ে গঠিত আরএসপিতে। এই জেলফেরতা বামপন্থী কর্মীদের অনেকেই জেল থেকে বেরিয়ে তাঁদের নতুন ধারার রাজনৈতিক কাজের জন্য আবার জেলে গেলেন, বিয়াল্লিশের আন্দোলনে যোগ দিয়ে জেলে গেলেন আরএসপির নির্মল রায়চৌধুরী, আরসিপিআই-এর ক্ষেমেশ রায়চৌধুরীরা। বিয়াল্লিশের আন্দোলনে বীরভুমের গ্রামের সাঁওতালদের সংগঠিত করার কাজ করতে গিয়ে জেলে গেলেন রাণী চন্দ। অবনীন্দ্রনাথের ‘ঘরোয়া’ আর ‘জোড়াসাঁকোর ধারে’র অনুলেখক, ব্যক্তিগত সম্পর্কে শিল্পী মুকুল দের বোন এবং রবীন্দ্রনাথের সচিব অনিল চন্দের স্ত্রী। রাণী চন্দের ঠাঁই হলো প্রথমে সিউড়ি জেলে, তারপর রাজশাহী জেলে, জেনানা ফাটকে। রাণী চন্দের আগে বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক বন্দী হিসাবে জেলে থেকেছেন ননীবালা দেবী, দুকড়িবালা দেবী, সিন্ধুবালা দেবী, জ্যোতির্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায়, বিমলপ্রতিভা দেবী, লীলা নাগ, কমলা দাশগুপ্ত, বীণা দাশ (ভৌমিক), কল্যাণী দাশ (ভট্টাচার্য), শান্তি ঘোষ (দাশ), ইন্দুসুধা ঘোষ, কল্পনা দত্তরা।

১৯৪৭ সালে ক্ষমতা হস্তান্তর হল, ভারত আর ব্রিটিশের প্রত্যক্ষ উপনিবেশ রইলো না, তবুও 'স্বাধীন' ভারতের জেলখানায় রাজনৈতিক বন্দীরা রইলেনই। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেস শুরু হলো ১৯৪৮ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি, কলকাতায়। তখন কমিউনিস্ট পার্টি তেলেঙ্গানার লড়াই লড়ছে, আর বাংলায় তেভাগার লড়াই। হায়দ্রাবাদের নিজামের বিরুদ্ধে রাজ্য জুড়ে চলছিল আন্দোলন, এর মধ্যে কৃষকরা শুরু করেন দুর্বার আন্দোলন, নিজামের ঠ্যাঙাড়ে বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়েন কমিউনিস্ট পার্টির লাল ফৌজের যোদ্ধারা, চলতে থাকে এলাকা দখল করে মুক্তাঞ্চল বানানোর কাজ। দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসে তেলেঙ্গানার পথকেই মুক্তির পথ বলে গ্রহণ করা হল আর পার্টি কংগ্রেস শেষ হওয়ার কয়েক সপ্তাহ পরেই নিষিদ্ধ হল কমিউনিস্ট পার্টি, গ্রেপ্তার হলেন মণিকুন্তলা সেন, চারু মজুমদার, প্রীতি সরকার (বন্দ্যোপাধ্যায়), মঞ্জুশ্রী চট্টোপাধ্যায়, জলিমোহন কল, সুভাষ মুখোপাধ্যায় সহ অসংখ্য কমিউনিস্ট নেতা-কর্মী, জেলের মধ্যে বন্দিদের উপর হামলা চলতে থাকে, প্রেসিডেন্সি জেলে পুলিশ গুলি করে খুন করে রাজবন্দিদের, প্রতিবাদে দমদম জেলের রাজবন্দিরা লক-আপ প্রত্যাখ্যান করে আন্দোলন শুরু করলে সেখানেও পুলিশ গুলি-লাঠি-কাঁদানে গ্যস চালায়, নিহত হন দু'জন রাজবন্দি। রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তির দাবিতে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বাধীন মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির মিছিলে পুলিশ গুলি চালালে শহিদ হন লতিকা-প্রতিভা-অমিয়া-গীতা, ১৯৪৯-এর ২৭ এপ্রিল, মধ্য কলকাতার বৌবাজার স্ট্রিটে। অন্যদিকে, এসবের কাছাকাছি সময়েই, ১৯৪৮ সালে বীরভূমে আরসিপিআই পার্টি কংগ্রেসে রাজনৈতিক বিতর্কে পার্টি ভাঙাভাঙির পর, ১৯৪৮ সালে দিনাজপুরের গঙ্গারামপুরে আরসিপিআই নেতা ক্ষেমেশ চ্যাটার্জীর নেতৃত্বে কৃষক অভ্যুত্থান শুরু হয়, ১৯৪৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে পান্নালাল দাশগুপ্তের নেতৃত্বাধীন আরসিপিআই দমদম-বসিরহাটে সশস্ত্র অভিযান শুরু করে, গ্রেপ্তার হন প্রীতিশ (তান্তু) দে, পান্নালাল দাশগুপ্ত (দীর্ঘদিন আত্মগোপন করে থাকার পর ১৯৫১ সালে পার্ক সার্কাস থেকে গ্রেপ্তার হন) সহ আরসিপিআই নেতা-কর্মীরা। ১৯৬২ সালে ভারত-চিন সীমান্ত সংঘর্ষের সময় গ্রেপ্তার হন কমিউনিস্ট পার্টির চিনপন্থী কর্মীরা — তেভাগার সংগঠন করতে গিয়ে জেলখাটা চারু মজুমদার কিংবা চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহের বিপ্লবী 'মুক্তিতীর্থ আন্দামান'-এর লেখক গণেশ ঘোষ, বিপ্লবী সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার, গোপাল আচার্য, পঙ্কজ আচার্য, ওয়ার্কার্স পার্টির অধ্যাপক জ্যোতি ভট্টাচার্য, সুধীর মুখোটিরা গ্রেপ্তার হলেন 'ভারত রক্ষা' আইনে, কমিউনিস্ট পার্টি ও অন্যান্য বাম-গণতান্ত্রিকদের যৌথ বন্দিমুক্তি আন্দোলনের চাপে ১৯৬৩ সালে এঁরা ছাড়া পান। ১৯৬৭ সালের মে মাসে নকশালবাড়ির বিপ্লবী লড়াই এবং তার ধারাবাহিকতায় ১৯৬৯ সালে সিপিআই (এমএল) পার্টি তৈরির পর নকশালপন্থী রাজনৈতিক কর্মীদের উপর রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস নেমে আসে। জেল ভরে ওঠে নকশাল রাজনৈতিক বন্দিতে, চলতে থাকে বন্দি হত্যা। বহরমপুর জেলে খুন হন তিমিরবরণ সিংহ, যাদবপুর থানায় খুন হন আশুতোষ মজুমদার, হুগলী জেলে খুন হন দ্রোণাচার্য ঘোষ, লালবাজারে বন্দি অবস্থায় চিকিৎসা বন্ধ করে খুন করা হয় চারু মজুমদারকে। জেলের মধ্যে পুলিশী নির্যাতন ও যৌন অত্যাচারের শিকার হন মলয়া ঘোষ, অর্চনা গুহ, জয়া মিত্র, মীনাক্ষী সেন, কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়শ্রী (রুবী) ভট্টাচার্যরা। ১৯৭৭ সালে, বন্দিমুক্তি আন্দোলনের চাপে, পরিবর্তিত সরকার রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। তারপরেও সরকারের যাওয়া-আসা চলেছে, রাজনৈতিক বন্দিরা কিন্তু জেলেই থেকেছেন। সাম্প্রতিক সময়ে, আশি পেরোনো কবি ভারাভারা রাও গুরুতর অসুস্থ হওয়া সত্ত্বেও ২০১৮ সালের অগাস্ট থেকে জেলবন্দি থেকেছেন। ভারাভারা রাওয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ যে তিনি নাকি ২০১৮র জানুয়ারিতে মহারাষ্ট্রের ভীমা-কোরেগাঁওয়ে দলিত সংগঠনগুলির উদ্যোগে যে অনুষ্ঠান হয় তার 'ষড়যন্ত্রে' যুক্ত ছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ থাকুক, ভীমা-কোরেগাঁওয়ে দলিতদের উপর হামলা চালায় ব্রাহ্মণ্যবাদী বাহিনী, তাদের কোনও শাস্তি হয় না, উল্টে দলিত জমায়েতে মাওবাদী যোগের গপ্পো ফেঁদে সাজানো মামলায় পুলিশ গ্রেপ্তার করে ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠক ও আইনজীবী সুধা ভরদ্বাজ, অধ্যাপিকা ও নারী আন্দোলনের কর্মী সোমা সেন, কবি ভারাভারা রাও, আইনজীবী সুরেন্দ্র গ্যডলিঙ, রাজনৈতিক বন্দিমুক্তি আন্দোলনের কর্মী রোনা উইলসন, সমাজকর্মী মহেশ রাউত, অরুণ ফেরেইরা, ভার্নন গঞ্জালভেস, সাংবাদিক গৌতম নভলখা, অধ্যাপক ও দলিত আন্দোলনের তাত্ত্বিক আনন্দ তেলতুম্বডেদের। ভারাভারা রাওদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলির মধ্যে একটি হল, তাঁরা নাকি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে হত্যার চক্রান্ত করেছিলেন; ইতিহাসের দিকে চোখ ফেরালে দেখবো যে বাঙলার এক বামপন্থী বিপ্লবী সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরকেও মুসোলিনির ফ্যাসিস্ট সরকার এরকম সাজানো অভিযোগে ইতালির জেলে ঢুকিয়েছিল, সৌম্যেন ঠাকুরের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে তিনি নাকি মুসোলিনী হত্যার ছক করছেন! আসলে ভারাভারা রাওরা সকলেই নিপীড়িতের অধিকারের লড়াইয়ের সংহতিতে থাকা মানুষ, আর শাসকের চোখে সেইটেই এদের 'অপরাধ', যেমন 'অপরাধী' ছিলেন বিরসা মুন্ডা, ভগৎ সিংরা। সুধা ভরদ্বাজ, সোমা সেন, ভার্নন গঞ্জালভেসরাও কমবেশি সকলেই অসুস্থ, গণ-আন্দোলনের সংহতিতে থাকার কারণে দীর্ঘদিন ধরে জেলবন্দি দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শারীরিক প্রতিবন্ধী জিএন সাইবাবা, এরা বাদেও দেশের বিভিন্ন জেলে

আটক নাম জানা, না-জানা রাজবন্দিরা এক দুর্বিসহ পরিস্থিতির মধ্যে আছেন, ভারাভারা রাও এবং আসামে জেলবন্দি রাজনৈতিক কর্মী যাটোর্দ্ধ অমিতাভ বাগচী করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন, রাষ্ট্র এদের খুন করতে চায়। আমরা কি যতীন দাশ, সন্তোষ মিত্র, আশু-তিমির, চারু মজুমদারদের মতোই এদেরও গারদের অন্ধকারেই খুন হতে দেখবো, নাকি একজোট হয়ে আওয়াজ তুলবো, 'সমস্ত রাজবন্দির মুক্তি চাই'?

এই লেখাটির একটি সংক্ষিপ্ত রূপ 'সিলি পয়েন্ট' ওয়েব ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়েছিল।

লকডাউনের পর- আমাদের হিসেব নেওয়ার পালা

অতিমারী সামলানোয় ভারতের প্রচেষ্টা ডেকে এনেছে ভয়ঙ্কর বিপর্যয় —কে দায়ী এরজন্য ?

অরুন্ধতী রায়

লকডাউন থেকে আমরা বেরিয়ে আসার পর, আমার ভাবনা কি? দেরি না করে, সাবধানতার সঙ্গে এর দায়-দায়িত্বের হিসেব কষাটা সবিশেষ জরুরি।

গত ২৪শে মার্চ, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশের ১৩৮ কোটি মানুষকে মাত্র চার ঘন্টার নোটিশে, পৃথিবীর মধ্যে নূন্যতম পরিকল্পনার এক দীর্ঘ, যন্ত্রণাময় লকডাউনের ঘোষণা করলেন। আর লকডাউনের ৫৫ দিন পরে, এমনকি সরকারের চেপে রাখা অনির্ভরযোগ্য তথ্যেও জানা যাচ্ছে, ভারতে কোভিড-১৯ আক্রান্ত পজিটিভ রোগীর সংখ্যার লেখচিত্রের রেখা উর্ধগামী হয়েছে, আক্রান্তের সংখ্যা ৫৪৫ থেকে হয়েছে ১ লক্ষ। সংবাদে প্রকাশ, প্রধানমন্ত্রীর কোভিড-১৯ টাস্কফোর্সের বক্তব্য অনুযায়ী, সঠিক পদক্ষেপ না নেওয়ায় লকডাউন ব্যর্থ হয়েছে।

সৌভাগ্যক্রমে, এদেশের অধিকাংশ রোগীই উপসর্গহীন, আর আমেরিকা, ইউরোপীয় দেশগুলোর তুলনায় অনেক কম সংখ্যক রোগীর জন্য ইন্টেন্সিভ কেয়ার-এর দরকার হচ্ছে। রোগটিকে উপলক্ষ্য করে সেনাবাহিনীর আলঙ্কারিক উপস্থাপনা, ভীতি সম্প্রচার, ঘৃণা ছড়ানো, বিশেষ সম্প্রদায়ের উপর কলঙ্ক লেপন — এসব কিছুর পর, আমরা শুনছি লকডাউন শিথিল করা হবে, আর আমাদের ভাইরাস নিয়েই বাঁচা শিখতে হবে।

ভারতে আমরা অসুস্থতাকে সঙ্গে নিয়েই বেঁচে থাকি। সরকারের দেওয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এযাবৎ ভারতে কোভিড-১৯ -এ আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন ৩০০০-এর কিছু বেশী মানুষ। ওই একই সময়কালে (৩০শে জানুয়ারি থেকে), প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী জানা গেছে, প্রায় ১.৫ লক্ষ মানুষ, যাদের বেশিরভাগই দরিদ্র, মারা গেছেন নিশ্বাস-বাহিত নানারকম ছোঁয়াচে রোগ, যক্ষা ইত্যাদি — এমন সব রোগে যেগুলো ওসুধে প্রতিরোধ করা যায়।

ভারত প্রত্যক্ষ করলো, পরিকল্পনাহীন ৫৯ দিন ব্যাপি লকডাউনের (যেটা কাশ্মীরের জন্য করা হয়েছে ১২০ দিনের লকডাউন আর ১০ মাসের ইন্টারনেট বন্ধ) এক আতংকময় দুঃস্বপ্ন, যে আতংক থেকে আমরা কোনদিন নিস্কৃতি পাবো না। লকডাউন হওয়ার আগেই দেশের বেকারত্বের হার পৌঁছেছিল বিগত ৪৫ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ শিখরে। হিসেবে দেখা যাচ্ছে এই লকডাউনের ফলে কাজ গেল দেশের ১৩.৫ লক্ষ কর্মজীবীর।

কয়েক শতক ধরে আমরা কাটিয়েছি — অস্পৃশ্যতা — জাতের প্রতি বিদ্বেষ নিয়ে। এখন ধর্মীয় বিদ্বেষ পৌঁছে গেছে তার চুড়ান্ত পরিণতিতে।

বিভিন্ন শহরে, লাখো শ্রমিকরা দেখলো তারা অসহায়, খাবার নেই, আশ্রয় নেই, নেই পয়সাকড়ি, এমন কি ঘরে ফেরার নেই কোন পরিবহনও। বন্যার স্রোতের মতো দলে দলে আতংকিত মানুষ হেঁটে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে পালাতে শুরু করলো, শহর ছেড়ে তাদের নিজেদের গ্রামে, সেই ২৫শে মার্চ থেকে শুরু করে পরের সব ক'টি সপ্তাহ ধরে।

সম্মান, ভরষা সব হারিয়ে, আত্মসম্মানী মানুষ যাত্রা শুরু করলো মাইলের পর মাইল পায়ে হেঁটে, কখন সাইকেলে, কখনো বা প্রাইভেট ট্রাকে মালের মতো ঠেসে, বেআইনীভাবে। তারা তাদের সঙ্গে নিয়ে গেল ভাইরাস, ছড়িয়ে দিলো দেশের প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে দাবানলের মতো। তাদের এই মরিয়া যাত্রায়, অনেকে মারা গেল অনাহারে, অপরিসীম ক্লান্তিতে, নয়তো দুর্ঘটনায়।

রাজপথে হাঁটার সময়ে পুলিশী নির্যাতন থেকে বাঁচতে তারা রেলের লাইন ধরে হাঁটতে শুরু করলো। এরপর, ১৬ জন মানুষ মাল-ট্রেনের চাকায় ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে মারা যাওয়ায়, পুলিশ রেলের লাইন ধরে পাহারা দিতে শুরু করলো। তখন আমরা দেখলাম মানুষ নদীর পাড় ধরে হাঁটা ধরলো তাদের বোঁচকা আর কাঁধের উপর সন্তানকে নিয়ে। কাজ হারিয়ে তারা পেটের জ্বালায় তাদের ঘরে ফিরছে।

আমরা দেখলাম খাবারের জন্য পদপিষ্ট হতে। দেখলাম, হাজারে হাজারে মানুষ বাসষ্ট্যান্ডে, রেল স্টেশনে কাতার দিয়েছে (সামাজিক দূরত্ববিধি এখানে নিষ্ঠুর রসিকতা ছাড়া কিছুই নয়), তাদের গ্রামে ফিরতে চাওয়ার সংকট শুরু হওয়ার অনেকগুলো সপ্তাহ কেটে যাওয়ার পর, সরকারি ব্যবস্থার কিছু ট্রেন বা বাসে একটা জায়গা পাওয়ার আশায়। এই হাড় হিম করা আতংকের যাত্রা সম্পর্কে আমাদের খুব সামান্যই ধারণা আছে। এর গভীরতা এবং ব্যাপ্তি সম্পর্কে আমরা জানিও খুব কম।

দেশবাসীর উদ্দেশ্যে তাঁর বিভিন্ন ভাষনের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী মোদী মাত্র একবারই কর্মস্থল ছেড়ে শ্রমিকদের ফিরে যাওয়ার এই ঘটনার উল্লেখ করেছেন, তবে তাকে ঘুরিয়ে হিন্দু ধর্মের বিশ্বাস- 'তপস্যা ও ত্যাগ'-এর মোড়কে উপস্থাপিত করেছেন।

ইতিমধ্যে, বহু বিজ্ঞাপিত 'বন্দে ভারত' প্রকল্পের মাধ্যমে বিদেশে আটকে পড়া বহু ভারতীয়কে দেশে ফেরানোর কাজ শুরু হয়েছে। ভবিষ্যৎ রোগাক্রমণ রুখতে, উড়ান শ্রেণিগুলোতে 'সামাজিক দূরত্ববিধি' মানা কতখানি নিশ্চিত করে যাত্রা সুরক্ষিত করা হয়েছে, তা দেখাতে, টিভি খবরগুলোর প্রর্দশনীতে এয়ারপোর্ট এবং প্লেনের ভিতরে জীবাণুমুক্ত করার বিধি নিয়ে বিশদ আলোচনা হয়েছে।

কোভিড-১৯-এর যুগে, এক শ্রেণির প্রতি সবিশেষ যত্ন, আর অপরদের প্রতি খোলাখুলি নিষ্ঠুরতা থেকে মনে হচ্ছে, ভবিষ্যতে উড়ান শ্রেণী আর হন্টন শ্রেণির মধ্যে সম্পর্ক সম্পূর্ণভাবে রুদ্ধ হয়ে যাবে এবং কখনো কারো সাথে কারোর শারীরিক মোলাকাত হবে না। কয়েক শতক ধরে আমরা কাটিয়েছি অস্পৃশ্যতা- জাতের প্রতি বিদ্বেষ নিয়ে। এখন ধর্মীয় বিদ্বেষ পৌঁছে গেছে তার চুড়ান্ত পরিণতিতে।

আমাদের নতুন মুসলমান বিরোধী নাগরিকত্ব আইন হয়েছে, আর নতুন নাগরিকপঞ্জির কাজ চলছে। নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে যারা বিক্ষোভ দেখিয়েছে, তাদের মধ্যে বেশিরভাগ মুসলমান যুবক-যুবতীদের জামিনের অধিকারহীন ভয়ঙ্কর কালা আইনে গ্রেফতার করা হয়েছে। মুসলমান ঘনবসতিপূর্ণ বস্তি আর বিরাট, বিরাট ডিটেনসন সেন্টারের বাস্তব অস্তিত্ব রয়েছে ভারতে। এবার আমরা শ্রেণী বিদ্বেষকে স্বাগত জানাতে পারি। স্পর্শহীনতার এই যুগে, এক শ্রেণির মানুষের শরীর আর এক শ্রেণির কাছে জৈব-বিপজ্জনক বলে বিবেচিত হবে।

জৈব-বিপজ্জনক শরীরের দরকার শ্রমের জন্য, ঝুঁকিপূর্ণ, বিপজ্জনক অবস্থায়, কোন রকম সুরক্ষা ব্যবস্থা ছাড়া। আর চাকুরীজীবী শ্রেণি — তাদের জায়গা নেবে যতদূর সম্ভব বিপদবিহীন যন্ত্র। বাকি উদ্বৃত্ত শ্রমিক শ্রেণি — বিশ্বের অধিকাংশ জনতা — শুধু ভারতের নয় সারা পৃথিবীর — তাদের কী হবে? এই অদ্ভুত অবস্থার জন্য কে দায়ী? আমি মনে করি, ভাইরাস নয়।

তাই আমাদের দরকার কোভিড ট্রায়াল, আন্তর্জাতিক আদালতে। লকডাউন পরবর্তী সময়ের জন্য এটুকুই আমার ভাবনা।

ফিনান্সিয়াল টাইমস, ২৪ মে ২০২০-তে প্রকাশিত। অনুবাদ: পার্থ সিংহ

এপিডিআর সরাসরি সদস্য সমন্বয়ের সাম্প্রতিক প্রকাশনা

ডিজিটাল যুগে গণনজরদারি: রাষ্ট্র ও মানবাধিকার : সুজাত ভদ্র

লাদাখে সীমান্ত-বিরোধ পেকে ওঠার পর গুচ্ছ চিনা অ্যাপ নিষিদ্ধ করে নাগরিকদের কাছে বর্জনের ডাক দিয়েছে ভারত সরকার। নাকি স্পর্শকাতর বহু তথ্য ফাঁস হয়ে যেতে পারে ওই সব অ্যাপের মাধ্যমে। প্রশ্ন হল, এতই যদি জানকারি, আগে বলা হয়নি কেন? নাগরিকের বহু তথ্যই তো তা হলে এত বছরে ফাঁস হয়েছে। আরও তো কত হাজার একই রকম অ্যাপ রয়েছে। তার বেলা? বিরোধ পেকে না-উঠলে বুঝি বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণও লাগে না? এই যে ফেসবুকওয়ালারা তাদের ব্যবসায়িক স্বার্থে বিজেপি-সঙ্ঘীদের রসেবশে রাখে, সরকার-কর্পোরেটের তেমন আঁতাঁত থাকলে কি সিঁদ কাটা চলে যৌথ উদ্যোগেই? ইজরায়েলের পেগাসাসের মাধ্যমে সরকারই তো গোপনে নজর রেখেছে নাগরিকের মেলে। আরোগ্যসেতু অ্যাপ নিয়ে এত চাপাচাপিও কি কম রহস্যময়? সুরক্ষা, নিরাপত্তার ছলনায় জবরদস্ত নজর-জালে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, গোপনীয়তা হরণ কোন ধরনের সভ্যতা? সবাইকে সন্দেহভাজন ভাবা ও ভাবানোর এই রাষ্ট্রীয় সংস্কৃতির মুখোশ খুলতেই এই লেখা। আর সতত স্মরণে রাখা: those who would sacrifice liberty for security deserve neither। নাগরিকের পারস্পরিক বিশ্বাস, সম্প্রীতি ও সমমর্মিতাই শ্রেষ্ঠ রক্ষাকবচ স্বাধীনতার।

প্রচ্ছদ: সোমশঙ্কর রায়, বিনিময়: ১২০ টাকা। বই সংগ্রহে যোগাযোগ: ৮৪২০৪ ২৪০৭৯, ৯৮৭৪৬ ৭১৯২৪।

প্রতিবাদী মেয়েদের ডবল লকডাউন চলছে

কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়

জাতীয় নাগরিক পঞ্জির বিরুদ্ধে নভেম্বর থেকেই ভারতের প্রায় সব রাজ্যে আন্দোলন শুরু হতে থাকে। পথসভা সেমিনার মিছিল রোজকার ঘটনা। বেশ কয়েকটি মিছিলে লক্ষেরও বেশি মানুষের উপস্থিতি দেখা যায়। ভারতের নানা জায়গায় গড়ে ওঠে জাতীয় নাগরিক পঞ্জি বিরোধী অবস্থান মঞ্চ। মিটিং মিছিল মঞ্চ সব জায়গায় মেয়েরা সংখ্যাধিক্য এবং এঁরা বেশিরভাগই মুসলমান সম্প্রদায়ের। ২০২০-র ৭ জানুয়ারি দিল্লির শাহীনবাগের মঞ্চ শুরু হয়, ৮ থেকে ৮০ বয়সের নারীরা অংশ নেন। কলকাতার পার্ক সার্কাসে ১৪ জানুয়ারি থেকে শুরু হয় জাতীয় নাগরিক পঞ্জি বিরোধী অবস্থান মঞ্চ।

এতদিন মুসলমান মানুষকে সবসময় তাঁরা কতটা ভাল ভারতীয় এই পরীক্ষা দিয়ে যেতে হয়েছে এবার তাঁরা চোখে চোখ রেখে প্রতিবাদ করছে। যে মেয়েদের বাহির বলে কিছু ছিল না অন্দরই ছিল জগৎ তারা আজ বাইরে বেরিয়ে এসেছে শ্লোগান তুলেছে — "আজাদি"। এ আজাদি পিতৃতন্ত্রের বিরুদ্ধে, ক্ষমতার বিরুদ্ধে, বিশেষ করে বছরের পর বছর ধরে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক করে রাখার বিরুদ্ধে আজাদি। এবং ক্ষমতার জোরে দেশের নাগরিককে দেশহীন বেনাগরিক করার বিরুদ্ধে এই আজাদির আওয়াজ। সারা ভারতে আড়াইশোর বেশি এইরকম মঞ্চ গড়ে ওঠে। বিশিষ্ট মানুষ থেকে তরুণ ছাত্রছাত্রী যোগ দেন এঁদের সমর্থনে। শীতের কামড় গুন্ডাদের গুলি, পুলিশের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে তাঁদের দাবিপূরণের অঙ্গীকারে পিছু হটেন না। রাষ্ট্রনেতারা নানাভাবে চাপ সৃষ্টি করতে থাকে, এমনকী পুলিশের যোগসাজশে মুসলিমদের ওপর গণহত্যা নামিয়ে আনে। ধর্ষণ, বাড়িঘর, দোকান ভাঙা, লুটপাট, খুন, সবই করতে থাকে শাসক-আশ্রিত গুন্ডা-পুলিশ। মঞ্চ ওঠানো যায় না।

ঠিক এইসময়ই শাসকের কাছে "পৌষমাস" হয়ে আবির্ভূত হয় কোভিড-১৯ বা করোনা। প্রধানমন্ত্রী লকডাউনের ঘোষণা করে। মঞ্চ তুলে নিতে বাধ্য হন প্রতিবাদী নারীরা। এরপরই প্রতিহিংসাপরায়ণ শাসক একের পর এক নারীকে গ্রেফতার করতে থাকে। প্রতিবাদী মুসলিম পুরুষ, যেমন শারজিল, মিরান হায়দার, আসিফ ইকবাল, আমির মিনটোই প্রমুখকেও গ্রেফতার করে। দিল্লি পুলিশ ১০ এপ্রিল বাড়ি থেকে সফুরা জারগারকে গ্রেফতার করে। ১১ এপ্রিল মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট দুদিনের পুলিশ কাস্টডির নির্দেশ দেন। অভিযোগ, ২২-২৩ ফেব্রুয়ারি তিনি জাফরাবাদ মেট্রো স্টেশনের রাস্তা অবরোধ করেছেন। ১৩ এপ্রিল বিচারক বেল দেন, সেদিনই আবার গ্রেফতার করা হয়। সফুরা জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স করার পর এম ফিল করছেন। তিনি যখন ধরা পড়েন তখন তিন মাসের অন্তঃসত্ত্বা। সফুরার পলিসিস্টিক ওভারি, ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন, হাই ব্লাড প্রেশার, তবু তাঁকে হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হয় না। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি উস্কানিমূলক এবং এমন জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়েছেন সেই আগুনে উত্তর-পূর্ব দিল্লিতে দাঙ্গা (গণহত্যা) সঙ্ঘটিত হয়। এই কারণেই তাঁকে ইউএপিএ দেওয়া হয়। তিনবার তাঁর জামিন নাকচ হয়। আমেরিকার বার কাউন্সিল তাঁকে মুক্তি দেওয়ার অনুরোধ জানায়। এখানকার বিশিষ্টজনেরা তাঁর মুক্তির দাবি করে। অবশেষে ২৩ জুন ২০২০ তিনি জামিনে মুক্তি পান। এনআরসি-র বিরোধিতা করে গ্রেফতার হন গুলফিশা ফতিমা। গুলফিশা দিল্লি ইউনিভার্সিটি থেকে গ্রাজুয়েশন আর মাস্টার্স এবং একটি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি থেকে এমবিএ করেছেন। গুলফিশার বিরুদ্ধেও দিল্লির দাঙ্গা সঙ্ঘটিত করার অভিযোগ। ইসরাত জাহান এনআরসি-র বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছিলেন। সেই কারণে তিনিও দিল্লির দাঙ্গা ঘটানোর অভিযোগে অভিযুক্ত। ইসরাত জাহান কংগ্রেস কাউন্সিলর।

জেএনইউ-র ছাত্র দেবাঙ্গনা কলিতা ও সাতাশি নারওয়াল অবশ্য মুসলিম সম্প্রদায়ের মেয়ে নয়। কিন্তু এদেরও অপরাধ কম নয়। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে বাস করে এরা নারী অধিকারের কর্মী। আর এরা 'পিঞ্জরা তোড়' সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। যে মনুবাদী সমাজ নারীকে মনে করে "নরকের দ্বার", যে সমাজ খাঁচায় বন্দি মেয়েদের ডানা ঝাপটানো দেখতে পছন্দ করে, এই মেয়েরা সেই খাঁচা ভাঙতে চায় এতবড় গর্হিত অপরাধ! ভরো পিঞ্জরাতে। অভিযুক্ত করো দাঙ্গা সঙ্ঘটিত করার অভিযোগে। দাও ইউএপিএ। যাতে খাঁচা থেকে বের হতে না পারে। খাঁচা ভাঙা তো দূরের কথা।

কাশ্মীরকে দশ মাস অবরুদ্ধ রেখেও প্রতিহিংসা চরিতার্থ করা যাচ্ছে না। ভারতীয় সেনারা ধর্ষণ খুন ঘটিয়ে চলেছে — এর ওপরে এতটুকু প্রতিবাদও সহ্য করতে পারছে না। অ্যান্টি টেরর ল-তে গ্রেফতার করেছে কাশ্মীরি ফোটোগ্রাফার মাসবত্ জেহেরাকে। তাঁর অপরাধ, কাশ্মীরে যা ঘটছে সেই ছবি তুলে তা প্রকাশ করা। গওহর গিলানি সাংবাদিক ও লেখক। তাঁর অপরাধ কাশ্মীরের সংবাদ পরিবেশন। এর জন্য তিনি গ্রেফতার হয়েছেন। এই দুটি ঘটনায় মানুষ বিক্ষোভে পথে নেমেছে,

হাতে পোস্টার: "True Journalism is not crime", "True Photography isn't crime"।

"শিবঠাকুরের আপন দেশে/আইন কানুন সর্বনেশে।" এখানে "গোলি মারো সালোঁকো" বলা অনুরাগ ঠাকুর বা গণহত্যায় মদত দেওয়া কপিল মিশ্র দিব্যেন্দু বহাল তবিয়তে থাকে, ঠিক যেমন ২০১৮ সালে ভীমা কোরেগাঁও ঘটনা ঘটিয়ে দলিত-ত্রাস মিলিন্দ একবতে বা সম্ভাজি ভিড়ে গুরুজি সহজেই ছাড়া পেয়ে যায়। জেলে যান অশীতিপর বয়স্ক ভারাভারা রাও, ষাটোর্ধ্ব সোমা সেন, গৌতম নভলাখা এবং সুধা ভরদ্বাজ, রোনা উইলসন, আনন্দ তেলতুম্বড়ে ও আরও কয়েকজন বিশিষ্ট মানবাধিকার কর্মী; কাশ্মীরে দিনের পর দিন তরুণদের জঙ্গি বলে হত্যা করে, মেয়েদের ধর্ষণ করে পার পেয়ে যায় ভারতীয় সেনারা আর বন্দি হয় কাশ্মীরের আসল ছবি ও সংবাদ তুলে ধরা সাংবাদিকরা। এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটানোর জন্য মানুষ আন্দোলন গড়ে তুললে মানবাধিকার কর্মীরা অবশ্যই তাদের পাশে থাকবে।

নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০- বিক্রির তালিকায় এবার গোটা শিক্ষাব্যবস্থা

সৌমেন

জাতীয় শিক্ষানীতি (NEP) ২০২০ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে শিক্ষাবিদ তথা সমাজকর্মী অনিল সদ্‌গোপাল একটা খাঁটি কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন যেকোনও শিক্ষানীতিকে ভালোভাবে বুঝতে গেলে দরকার শিক্ষানীতির ছাপা লাইনগুলোর মাঝে ফাঁকা অংশটাকে বোঝা। সেখানে আপাতদৃষ্টিতে কিছু লেখা না থাকলেও না বলা কথাগুলো বুঝে নেওয়াটা খুব দরকার। নতুন শিক্ষানীতি ২০২০-র ক্ষেত্রেও সেই একই কথা প্রযোজ্য। নতুন শিক্ষানীতি নিয়ে গত ৫-৬ বছর ধরে যে তর্ক-বিতর্ক চলছে তার দিকে না তাকালে আমরা ভালোভাবে বুঝতে পারব না যে ঐ ফাঁকা অংশগুলোতে কোন কোন কথা চেপে যাওয়া হয়েছে। অতীতে শেষবারের মতো শিক্ষানীতির খসড়া তৈরী হয়েছিল ১৯৮৬ সালে এবং সেটার সংস্করণ করা হয়েছিল ১৯৯২ সালে। বর্তমান শাসকদল BJP ক্ষমতায় আসার আগে থেকেই নিজেদের ২০১৪ সালের নির্বাচনী ইস্তাহারে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে ক্ষমতায় এলে তারা নতুন শিক্ষানীতির খসড়া প্রকাশ করবে। কথামতো ক্ষমতায় আসার পর থেকেই তারা নিজেদের দলের লাইনে এবং কর্পোরেট প্রভুদের স্বার্থ রক্ষা করে শিক্ষাব্যবস্থায় ঢালাও পরিবর্তনের চেষ্টা শুরু করে। ২০১৫ সালের অক্টোবর মাসে টি. এস. আর. সুব্রামানিয়াম-এর নেতৃত্বে 'কমিটি ফর ইভলিউশান অফ দি নিউ এডুকেশন পলিসি' নামে একটা কমিটি তৈরী করা হয়, যে কমিটি ২০১৬ সালের মে মাসে নিজেদের রিপোর্ট জমা দেয়। এই রিপোর্টের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ঐ বছরই MHRD 'সাম ইনপুট্স ফর ড্রাফ্ট ন্যাশনাল এডুকেশনাল পলিসি ২০১৬' নামে একটা ৪৩ পাতার দলিল প্রকাশ করে। এই দলিলে শিক্ষাব্যবস্থার বেসরকারীকরণ এবং মনুবাদীকরণের সুস্পষ্ট ছাপ থাকায় এটাকে কেন্দ্র করে সেই সময় শিক্ষক-অধ্যাপক মহলে এবং ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সমালোচনার ঝড় ওঠে। কিন্তু সেসবে কান না দিয়ে ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন-এর প্রাক্তন অধিকর্তা কে. কস্তুরীরঙ্গণ-এর নেতৃত্বে বিশেষজ্ঞদের একটা প্যানেল পরবর্তী দু'বছরেরও বেশী সময় ধরে একটা খসড়া প্রস্তাব তৈরী করে। শুধু ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে জয়ের অপেক্ষা ছিল। সেখানে জয়লাভ করে ২৬-এ মে ২০১৯ তারিখে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দ্বিতীয়বারের জন্য ক্ষমতার আসনে বসেন এবং ৩১-এ মে তারিখে MHRD-র কাছে জমা পড়ে কস্তুরীরঙ্গণ কমিটির ৪৮৪ পাতার রিপোর্ট 'ন্যাশনাল এডুকেশানাল পলিসি ২০১৯'। বর্তমানের ৬৬ পাতার নতুন শিক্ষানীতি ২০২০-এর ছাপা লাইনের মাঝে ফাঁকা অংশগুলোতে যেসমস্ত না বলা কথাগুলো লুকিয়ে আছে তার খোঁজ পাওয়া যাবে ২০১৯ সালের সেই রিপোর্টে, যেখানে শিক্ষাকে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল 'কোয়াসি-পাবলিক গুড' হিসাবে। বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে সকলের মৌলিক অধিকার হিসাবে শিক্ষাকে নিশ্চিত করার কোনও দায়দায়িত্ব সরকারের নেই। শিক্ষাব্যবস্থাকে আলু-পটলের মতো কেনাবেচার সামগ্রীতে পরিণত করা, শিক্ষাব্যবস্থার অবাধ বেসরকারীকরণ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মনুবাদীকরণ বা RSS-BJP-এর মতাদর্শগত প্রভাব বিস্তার করা, এবং সর্বোপরি দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর উপর আঘাত হানার যে চিত্র আমরা ২০১৪ সাল থেকে দেখে এসেছি সেটারই একটা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল কস্তুরীরঙ্গণ কমিটির রিপোর্টে। বর্তমানের এই জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ আসলে নতুন কিছু সংযোজনসহ কস্তুরীরঙ্গণ কমিটির রিপোর্টেরই একটা সারাংশ। কর্পোরেট-নিয়ন্ত্রিত মূলধারার সংবাদমাধ্যম এই নতুন শিক্ষানীতির কিছু চটকদারী ঘোষণার কথা বারবার প্রচার করে এই নীতির পক্ষে জনমত তৈরী করতে ব্যস্ত। তাই এই পরিস্থিতিতে ভীষণভাবে প্রয়োজন সরকারের আসল উদ্দেশ্যগুলো জনগণের সামনে

নিয়ে এসে এই নতুন শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে একটা ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলা।

NEP ২০২০ প্রকাশ করার এক মাসে আগে ২৪-এ জুন ২০২০ তারিখে দেশের ৬-টা রাজ্যের স্কুলশিক্ষায় বদল আনার জন্য ভারত সরকার বিশ্ব ব্যাঙ্কের সাথে চুক্তি সম্পন্ন করেছে। এই চুক্তি সম্পন্ন করার সময় খুশীতে গদগদ হয়ে বলা হয়েছে যে গোটা দেশের স্কুলশিক্ষার আমূল পরিবর্তন করার এটাই হল শুরু। NEP ২০২০-র প্রচারের সময়তেও একই কথা বলা হচ্ছে। অর্থাৎ এই গোটা ব্যাপারটার মধ্যে বিশ্ব ব্যাঙ্ক নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে, যেমনটা অতীতেও ছিল। ভারতের শিক্ষাব্যবস্থাকে বর্বাদ করার জন্য বিশ্বব্যাঙ্ক-কে এইবার তৃতীয় বারের জন্য ডাকা হয়েছে। প্রথমবার ডাকা হয়েছিল নব্বইয়ের দশকে। সেই সময় তৎকালীন ভারত সরকার এবং বিশ্বব্যাঙ্ক মিলে দেশের ১৮-টা রাজ্যের অর্ধেকেরও বেশী জেলায় প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থাকে ধ্বংস করেছিল। প্রথম দশ বছরের মধ্যে সরকারী প্রাথমিক শিক্ষার এমনই ধ্বংসসাধন করা হয় যে তার পরের দশ বছরে দ্রুততার সাথে প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থায় বেসরকারীকরণ শুরু হয়ে যায়। প্রাথমিক শিক্ষাকে উন্নত করার জন্য বিশ্বব্যাঙ্ক সাহায্য করছে ইত্যাদি কথা আসলে ছিল বাহানা। আসল উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষাব্যবস্থাকে উন্মুক্ত করে দিয়ে শিক্ষা কেনাবেচার একটা বাজার তৈরী করা। ৬ থেকে ১৪ বছর বয়স্ক বাচ্চাদের বিনামূল্যে বাধ্যতামূলক শিক্ষা দেওয়ার জন্য রাইট টু এডুকেশান (RTE) অ্যাক্ট ২০০৯ বা শিক্ষার অধিকার আইন চালু হলেও তার মধ্যেই বিস্তর ফাঁকফোকর ছিল। বৈষম্যমূলক বহুস্তরীয় স্কুল ব্যবস্থাকে বৈধতা দেওয়া হয়েছিল এই আইনে, যা ভারতীয় অর্থনীতিতে বিশ্বব্যাঙ্ক এবং ইন্টারন্যাশনাল মানিটারি ফান্ড (IMF)-এর প্রভাব বিস্তারের প্রত্যক্ষ পরিণতি। এই ধরণের বহুস্তরীয় ব্যবস্থা হল সকলের জন্য সমান ব্যবস্থা তৈরী করার সম্পূর্ণ বিপরীত একটা ধারণা। ১৯৬৬ সালের কোঠারী কমিশনের শিক্ষা রিপোর্টে সুপারিশ করা হয়েছিল যে ভারতের গোটা শিক্ষাব্যবস্থাটা সকলের জন্য একটা সমান ব্যবস্থা হওয়া দরকার, যেখানে সমস্ত স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকাঠামোগত মাপদন্ড যেন সমান হয়। মাপদন্ডে পার্থক্য তৈরী করার মানেই হল সামাজিক-অর্থনৈতিক বৈষম্যকে প্রশ্রয় দেওয়া এবং ঘুরেফিরে এর পরিণামও হল বৈষম্যবৃদ্ধি। যদি প্রতি ৩০ জন পড়ুয়ার জন্য ১ জন করে শিক্ষক দরকার হয় তাহলে এই মাপদন্ড দেশের ১৪ লক্ষ স্কুলের জন্যই সমান প্রযোজ্য, শুধু ১১০০ কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় আর ৭০০ নভোদয় বিদ্যালয়ের জন্য নয়। এখানে আরও বলা হয়েছিল যে সমস্ত স্কুলেই ষষ্ঠ শ্রেণীর পর থেকে বিজ্ঞানের একটা করে গবেষণাগার থাকা প্রয়োজন। এটাও সেই গোটা ১৪ লক্ষ স্কুলের জন্যই সমান প্রযোজ্য। একমাত্র এই পরিকাঠামোগত সমানতার মাধ্যমেই এমন একটা ব্যবস্থা তৈরী করা সম্ভব ছিল যে ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতির ছেলেমেয়েরা যে স্কুল-কলেজে পড়বেন, রাষ্ট্রপতির চাপরাশির ছেলেমেয়েরাও সেখানে পড়তে পারবেন। কিন্তু বিশ্বব্যাঙ্ক এবং IMF-এর হস্তক্ষেপে ঠিক এর উল্টো পথেই হাঁটা হয়েছে। বহুস্তরীয় ব্যবস্থাকে প্রশ্রয় দেওয়ার মাধ্যমে ধীরে ধীরে বেসরকারীকরণের রাস্তা খুলে দেওয়া হয়েছে। কে কোথায় কতটা গুণমানের শিক্ষা পাবে তা নির্ধারিত হচ্ছে শিক্ষাকে কিনে নেওয়ার ব্যাপারে তার পরিবারের আর্থিক সামর্থ্যের উপর। কিন্তু এত কিছু সত্ত্বেও সরকারী ব্যবস্থাকে এখনও পুরোপুরি ধ্বংস করা যায়নি। তাই সেটাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করার জন্য বর্তমানে তৃতীয় বারের জন্য বিশ্বব্যাঙ্ক-কে ডাকা হয়েছে। এই শিক্ষানীতির গোটাটাকেই, বিশেষ করে স্কুলশিক্ষার ব্যাপারে যেসমস্ত ঘোষণা করা হয়েছে সেগুলোকে এই প্রেক্ষাপটেই দেখতে হবে।

স্কুলশিক্ষায় বিদ্যমান ১০+২ কাঠামোকে পরিবর্তন করে ৫+৩+৩+৪ কাঠামো করার কথা বলা হয়েছে, যেখানে ৩-৬ বছরের শিশুদেরও এই ব্যবস্থায় সামিল করা হয়েছে, যা আগে ছিলনা। কিভাবে এই গোটা ব্যাপারটা বাস্তবায়িত করা যেতে পারে তার দীর্ঘ প্রক্রিয়ার কথা বলা হয়েছে যা শুনতে বেশ ভালোই লাগবে। ৯-১০ এবং ১১-১২ শ্রেণীতে গ্রস এনরোলমেন্ট রেশিও (GER) কমে যাওয়া নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে এবং তাদেরকে শিক্ষাব্যবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু কিভাবে ? তার কোনও সদুত্তর নেই। উল্টে 'কোয়ালিটি হলিস্টিক এডুকেশান' ইত্যাদি গালভরা কথার মাধ্যমে শিক্ষার 'গুণমান'-এর উপর জোড় দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। ঠিক এই পয়েন্টে যদি কস্তুরীরঙ্গণ রিপোর্টের কাছে ফিরে যাওয়া হয় তাহলে দেখা যাবে সেখানে নির্লজ্জভাবেই বলা হয়েছিল – স্বাধীনতার পর থেকে দশকের পর দশক ধরে আমরা শিক্ষাকে সমাজের প্রতিটা স্তরে সমানভাবে পৌঁছে দেওয়া নিয়েই শুধু ভেবেছি, শিক্ষার গুণমান নিয়ে ভাবেনি। এই লাইন থেকেই উদ্দেশ্য পরিষ্কার হয়ে যায়। 'শিক্ষার গুণমান'-কে অজুহাত করে শিক্ষাকে সমাজের প্রতিটা স্তরে সমানভাবে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্বটাই আসলে ঝেড়ে ফেলতে চাইছে সরকার। আর এই একই অজুহাতে বেসরকারীকরণের পথ চওড়া করা হচ্ছে, যা স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষাকে এক শ্রেণীর মানুষের 'ক্রয়ক্ষমতার' বাইরে নিয়ে চলে যাচ্ছে। সরকারী বরাদ্দের দিকে তাকালেই ব্যাপারটা আরও পরিষ্কার হয়ে যায়। ২০১৮-১৯ সালে শিক্ষায় সরকারী খরচের পরিমাণ বিগত দশ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন। স্কুলশিক্ষার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের খরচ গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট (GDP)-এর অনুপাতে ০.২৮% থেকে কমিয়ে করা হয়েছে ০.২৭%। রাইট টু এডুকেশান অ্যাক্ট (RTE) ২০০৯-এর সংযোজন

এবং সর্বশিক্ষা অভিযান-কে রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান (নবম ও তার উপরের শ্রেণীর জন্য মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রকল্প)-এর সাথে সংযুক্ত করেছে বর্তমান সরকার। এর মূল উদ্দেশ্য হল সর্ব-শিক্ষা অভিযান-এর জন্য অনুদানের পরিমাণ কমিয়ে এর ক্ষমতা খর্ব করা। বিভিন্ন রাজ্য থেকে প্রাপ্ত তথ্য থেকে একথা পরিষ্কার যে এই সংযুক্ত প্রকল্পের জন্য যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে তা আগের তুলনায় কম। বলাই বাহুল্য যে একদিকে অবাধ বেসরকারীকরণকে প্রশ্রয় দিয়ে এবং অন্যদিকে ৩-৬ বছরের শিশুদেরকে নতুন কাঠামোতে এনে 'হলিস্টিক' শিক্ষাব্যবস্থার গালভরা কথা শুনিয়ে সবার কাছে সমান মানের শিক্ষা পৌঁছে দেওয়া যায়না। বরং একটা বৈষম্যমূলক ব্যবস্থাকে প্রশ্রয় দিয়ে একটা নির্দিষ্ট শ্রেণীর মধ্যে আরও কিছু 'ক্রেতা' তৈরী করা যায়। সরকারের দাবি আর বাস্তবের মধ্যে ফারাকটা অতীতের দিকে তাকালেই বোঝা যায়।

একমাত্র সরকারী স্কুলশিক্ষার মাধ্যমেই যে বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের এক ছাদের তলায় শিক্ষাদান সম্ভব সেকথা শিক্ষার অধিকার আইন, ২০০৯-তেও স্বীকার করা হয়েছিল। কিন্তু দশ বছর যেতে না যেতেই আসল রূপ বেরিয়ে পড়েছে। সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে থাকা শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেওয়া, যেটা আগে সরকারী ব্যবস্থায় ছিল বাধ্যতামূলক, সেটাকেই বেসরকারী ব্যবসায়ীদের "শুভ চিন্তা"-র উপর ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। RTE আইন মারফৎ 'বিনামূল্যে' শিক্ষা প্রদানের জন্য ২৫% আসন সংরক্ষণের নিয়মটা বাতিল করে দেওয়ার জন্য সেটাকে পুনরায় পর্যালোচনার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল কস্তুরীরঙ্গণ কমিটির রিপোর্টে। আর NEP ২০২০-তে তো লজ্জার মাথা খেয়ে ঘোষণাই করে দেওয়া হয়েছে যে বেসরকারী ফিলানথ্রপিক সংস্থাগুলোও যাতে সহজেই স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় বানাতে পারে তার জন্য নিয়ন্ত্রণকারী নিয়মগুলো শিথীল করে দেওয়া হবে। মানে ব্যবসার সুবিধার জন্য যেমন করোনা-পরবর্তী সময়ে একের পর এক শ্রম-আইন শিথীল করা হচ্ছে, তেমনই এবার শিক্ষাক্ষেত্রে বেসরকারী ব্যবসায়ীদের সুবিধা করে দেওয়ার পালা। অর্থাৎ আম্বানী যখন কর্পোরেট সোসাল রেসপনসিবিলিটি-র (CSR) মাধ্যমে কোনও বিশ্ববিদ্যালয় শুরু করার জন্য টাকা দেবেন তখন ওনার ট্যাক্স তো মাফ করা হবেই, পাশাপাশি সেখান থেকে আম্বানী যদি মুনাফা কামায় তাহলে সেখানেও রাখা হবেনা কোনও নিয়ন্ত্রণ। উল্টে আরও একধাপ এগিয়ে বলা হয়েছে যে পরোপকারী সংস্থাকেও প্রয়োজনে অনুদান দেবে সরকার ! নতুন শিক্ষানীতিতে এভাবেই 'ফিলানথ্রপি' শব্দের আড়ালে স্কুলশিক্ষার ক্ষেত্রকে বেসরকারী ব্যবসায়ীদের অবাধ লুঠের সামনে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে যে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আছে তার খামতিগুলোকে না শুধরে উল্টে সেই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাটাই তুলে দেওয়া হচ্ছে। একজন জেলা শিক্ষাধিকারী বা ডিস্ট্রিক্ট এডুকেশান অফিসার সরকারী স্কুলকে যে ক্ষমতায় প্রশ্ন করতে পারেন যে স্কুলে কতজন শিক্ষক আছে, আগের বছর বাজেট কত ছিল, ফি-বাবদ কত টাকা পাওয়া গেছে, খরচের পর কত টাকা বেঁচেছে ইত্যাদি, সেই একই ক্ষমতায় তিনি বেসরকারী স্কুলকেও একই প্রশ্নগুলো করতে পারতেন, এবং তাঁকে সেই উত্তরগুলো দিতে যেকোনও বেসরকারী স্কুল বাধ্য থাকত। কিন্তু নতুন ব্যবস্থায় নিয়ন্ত্রণ তুলে দেওয়ার মানেই হল বেসরকারী স্কুলগুলো আর এইসমস্ত প্রশ্নের জবাব দিতে বাধ্য নয়। 'শিক্ষার গুণমান' নিয়ে পাতার পর পাতা লেখার পরেও সরকারী স্কুলের পরিকাঠামোগত উন্নয়ন বা পর্যাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগের বিন্দুমাত্র চেষ্টা দেখা যায়না এই শিক্ষানীতিতে। উল্টে স্থানীয় স্তরে শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা ছেড়ে দেওয়া হয়েছে স্থানীয় সম্প্রদায়ের বিভিন্ন সদস্য, প্রবীণ ব্যক্তি, স্কুলের প্রাক্তনী, অবসরপ্রাপ্ত সরকারী বা আধা-সরকারী ব্যক্তিদের হাতে। নতুন কোনও চাকরি-সৃষ্টিও এই ব্যবস্থায় সম্ভব নয়। সবদিক থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে মৌলিক অধিকার হিসাবে শিক্ষাকে সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব সরকার আর নেবেনা।

স্কুলে ভর্তি কেন কম হচ্ছে সেই মূল সমস্যার দিকে নজর না দিয়ে বলা হয়েছে ভর্তি কম হলে সেই স্কুল বন্ধ করে দেওয়া হবে বা অন্য বড় স্কুল কমপ্লেক্সের মধ্যে জুড়ে দেওয়া হবে। অর্থাৎ ভর্তি কমের অজুহাতে বেসরকারীকরণ। ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে পড়ুয়ায়দের কোডিং শেখার সুযোগ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়াতে চোখ রাখলেই দেখা যাবে যে ইতিমধ্যেই অল্পবয়সী স্কুলপড়ুয়াদের অনলাইন কোডিং শেখানোর বিজ্ঞাপন নিয়ে হাজির হয়ে গেছে একাধিক বিদেশী কর্পোরেট সংস্থা। শিক্ষার বাণীজ্যিকীকরণের প্রবণতা স্পষ্ট। ষষ্ঠ শ্রেণীর পর থেকে পড়ুয়াদের জন্য 'ভোকেশানাল ট্রেনিং'-এর উপর জোড় দেওয়া হচ্ছে। এমনিতেই বিভিন্ন সামাজিক-অর্থনৈতিক কারণে প্রান্তিক সম্প্রদায়ভুক্ত ও নীচুজাতির পড়ুয়াদের ক্ষেত্রে মাঝপথে স্কুলছুট একটা সাধারণ ঘটনা। সেই সমস্যার সমাধান করা তো দূরের কথা, উল্টে 'ভোকেশানাল ট্রেনিং'-এর নামে স্কুলছুটকে আরও প্রশ্রয় দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পাশাপাশি অতীতে মোদী রাজত্বে শিশু শ্রম আইনে যে পরিবর্তন আনা হয়েছিল তাতে পারিবারিক ব্যবসায় শিশু শ্রমকে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। অর্থাৎ শুধু স্কুলছুটই নয়, প্রান্তিক সম্প্রদায়ভুক্ত ও নীচুজাতির পড়ুয়ারা স্কুলছুটের পর যাতে পরিবারের মধ্যেই শিশু শ্রমিকে পরিণত হতে পারে তার ব্যবস্থা আগেই করে রাখা হয়েছিল। অর্থাৎ এই মনুবাদী সরকার চায় যে এইসমস্ত জনগণের ভবিষ্যৎ নিজেদের বংশানুক্রমিক জাতিগত পেশার মধ্যেই চক্রের মতো ঘুরতে থাকুক; এককথায় বর্ণাশ্রম প্রথা টিকে থাকুক। বর্তমানে

শুধু তার পাশাপাশি 'ভোকেশানাল ট্রেনিং'-এর মাধ্যমে তাদেরকে স্বল্প-দক্ষ সস্তা মজুরে পরিণত করার একটা ব্যবস্থা করা হয়েছে। পাশাপাশি চলছে শিক্ষার দেদার মনুবাদীকরণ। স্কুলশিক্ষা থেকে শুরু করে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত জোড়-জবরদস্তি সংস্কৃত ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে, যা এই শিক্ষানীতির আগের খসড়াগুলোতেও ছিল। সম্প্রতি করোনা-অজুহাতে পড়ার বোঝা কমাতে CBSE-র পাঠক্রম থেকে বাদ পড়েছে বিবর্তন-এর অধ্যায়। প্রাচীন শাস্ত্রে উল্লেখ নেই বলে বাঁদর থেকে মানুষে বিবর্তনের ডারউইনের তত্ত্ব যে BJP সরকারের পছন্দ নয় তার উদাহরণ আমরা আগেও পেয়েছি। এবার কোপ বসেছে সোজা পাঠক্রমে। শুধু তাই নয় বাদ পড়েছে প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ এবং ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো সংক্রান্ত অধ্যায়ও। পরিবেশকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদকে কর্পোরেট লুঠের হাতে ছেড়ে দেওয়ার প্রবণতা করোনা-অতিমারীর সময়ে বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। গোটা বিশ্বজুড়ে পরিবেশ বাঁচানোর আন্দোলনে যেসময় স্কুল-পড়ুয়ারা খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে সেই সময় আমাদের দেশের সরকার চায়না যে পরবর্তী প্রজন্ম এই বিষয়টা নিয়ে ওয়াকিবহাল হোক। একইভাবে, ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোটা বর্তমান সরকারের ভীষণ অপছন্দের একটা ব্যাপার এবং অতীতেও সেই ধারণায় বারবার আঘাত করা হয়েছে। এই শিক্ষানীতির ক্ষেত্রেও রাজ্য সরকারের সাথে চূড়ান্ত আলোচনা না করেই তা প্রকাশ করা হয়েছে। এমনকি এই শিক্ষানীতিতেও শিক্ষা পরিচালনার ব্যাপারে রাজ্য সরকারের ক্ষমতা খর্ব করে একটা রাষ্ট্রীয় শিক্ষা আয়োগ নামে একটা কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপনের কথা বলা হয়েছে, যা পরিচালিত হবে খোদ প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশের আওতায় থেকে। তাই সরকার চায়না যে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো সম্বন্ধে পড়ুয়াদের মনে কোনও আগ্রহ তৈরী হোক।

উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও ঢালাও বেসরকারীকরণ ও ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণের নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। যে ইউনিভার্সিটি গ্রান্ট্স কমিশন (UGC) মারফৎ উচ্চশিক্ষার নিয়ন্ত্রণ এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকারী অনুদান বন্টন করা হত সেই UGC বাতিল করে হায়ার এডুকেশান গ্র্যান্ট্স কাউন্সিল (HEGC) এবং হায়ার এডুকেশান ফান্ডিং এজেন্সি (HEFA) তৈরীর কথা বলা হয়েছে এই নীতিতে। এ শুধু নামের পরিবর্তন নয়। সরকার এখন থেকে আর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে অনুদান দেবেনা, তার বদলে HEFA-র আওতায় ঋণ দেওয়া হবে, যে ঋণ শোধ করতে হবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকেই। বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ার খরচ যেভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে তা বহন করা এমনিতেই সাধারণ জনগণের আয়ত্তের বাইরে। এখন এই নীতির মাধ্যমে সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে ঋণচক্রে জড়িয়ে পরোক্ষভাবে চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে যাতে পড়ুয়াদের ফি-বৃদ্ধি করার মাধ্যমে ঋণ শোধের চেষ্টা করা হয়। অর্থাৎ পরোক্ষভাবে উচ্চশিক্ষাকে গরীব জনগণের কাছ থেকে আরও দূরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তার পরেও যদি এই ঋণ শোধ করা না যায় তাহলে সেই একই চিরাচরিত 'ক্ষতিতে চলার' অজুহাতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বন্ধক রাখা জমি, বিল্ডিং-সহ শিক্ষা পরিচালনার ভার তুলে দেওয়া হবে বেসরকারী পুঁজিপতিদের হাতে। ২০১৮-১৯ সালের সরকারী পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেশের ৭৭.৮% কলেজই বেসরকারী। বলাই বাহুল্য যে এই প্রবণতা আরও বাড়ছে। উচ্চশিক্ষায় HEGC-র মতোই গবেষণার ক্ষেত্রেও ন্যাশনাল রিসার্চ ফাউন্ডেশান (NRF) স্থাপনের মাধ্যমে ব্যবস্থাটার কেন্দ্রীকরণের চেষ্টা করা হয়েছে, যাতে পছন্দমতো গবেষণার বিষয় নির্বাচনের ক্ষমতা খর্ব করা যায়। সাম্প্রতিক অতীতেই দেখা গেছে যে 'জাতীয় প্রাধান্য' অনুযায়ী গবেষণার বিষয় নির্বাচন করার কথা বলে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উপর চাপ সৃষ্টি করেছে UGC। গবেষণার খাতে সরকারী অনুদানও কমতে কমতে প্রায় বন্ধ হওয়ার মুখে। গবেষণার বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করে কোনও বেসরকারী সংস্থা যদি ৫০% খরচ বহন করার প্রতিশ্রুতি দেয় তবেই বাকি ৫০% সরকার দেবে – এমন একটা নতুন প্রবণতা দেখা দিয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই গবেষণা থেকে ব্যবসায়িক 'লাভ'-এর কোনও আশা না দেখলে বেসরকারী সংস্থাও লগ্নি করবেনা। ফলে গবেষণা কি নিয়ে হবে সেটাও এখন পরোক্ষভাবে ঠিক হচ্ছে বেসরকারী ব্যবসায়ীদের আগ্রহের উপর ভিত্তি করে।

শিক্ষা কেনাবেচার এই বর্তমান ব্যবস্থায় উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ৩০০০ বা তারও বেশী ধারণক্ষমতা সম্পন্ন যেসমস্ত মাল্টি-ডিসিপ্লিনারী কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় তৈরীর কথা বলা হয়েছে সেগুলোর মাধ্যমে আসলে তৈরী করা হবে শিক্ষার কিছু বড় বড় বাজার, যেখানে একসাথে অনেক 'ক্রেতা' পাওয়া যাবে এবং চলবে শিক্ষার দেদার কেনাবেচা। বিদ্যমান ছোটো বা মাঝারী মাপের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সরকারী অনুদান এবং পরিকাঠামোগত উন্নয়নের অভাবে বন্ধ হয়ে যাবে, বা চালু থাকলেও এই বিরাট আয়তনের প্রতিষ্ঠানগুলোর আর তাদের মধ্যে একটা গুণগত ফারাক তৈরী হবে। অর্থাৎ ঘুরেফিরে সেই হয় একটা বিরাট সংখ্যক পড়ুয়া উচ্চশিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে বা একটা বৈষম্যমূলক শিক্ষাব্যবস্থার শিকার হবে। চার বছরের গ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামে যে একাধিক 'এক্সিট পয়েন্ট' ঘোষণা করা হয়েছে তা আসলে আরও বেশী পরিমাণে সস্তা মজুর তৈরীরই অভিসন্ধি। চার বছরের কোর্স সম্পূর্ণ করার পরেও দেশের যুব সম্প্রদায় চাকরি পাচ্ছেনা। বেকারত্ব গত ৪৫ বছরের মধ্যে সবথেকে বেশী। সেখানে মাঝপথে পড়া থামিয়ে বিভিন্ন সার্টিফিকেট লাভ করার পর তাদের চাকরির ভবিষ্যৎ কি হবে তা নিয়ে সরকার নিশ্চুপ। বরং ড্রপ-আউটকে একাধারে

প্রশ্রয় এবং বৈধতা দেওয়া হবে এই একাধিক 'এক্সিট পয়েন্ট' ব্যবস্থার মাধ্যমে। এই সমস্ত বড়-বড় মাল্টি-ডিসিপ্লিনারী কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন রকম ইচ্ছামতো বিষয় নিয়ে পড়ার সুযোগের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। ইঞ্জিনিয়ারিং, ডাক্তারী, গণিত ইত্যাদি বিজ্ঞান-ভিত্তিক বিষয়ের সাথে সঙ্গীত, যন্ত্রসঙ্গীত, ছবি আঁকা ইত্যাদি লিবারাল আর্ট্স-এর বিষয় নিয়ে পড়ারও সুযোগ থাকবে এখানে। এর ইঙ্গিত কস্তুরীরঙ্গণ কমিটির রিপোর্টেও ছিল। চটকদারি ছাড়া এটা আর কিছুই নয়। কারণ যে বিষয় নিয়েই পড়ুয়ারা পড়াশোনা করুক না কেন, চাকরির সুযোগ যে আসলে সীমিতই সেই বাস্তব থেকে দৃষ্টি ঘোরাতে চাইছে সরকার। বরং সাম্প্রতিক প্রবণতা, যেমন - ইন্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেস-এ ২০১৪ সালের পর থেকে প্রতি বছর লাগাতার বিজ্ঞানের নামে প্রাচীন ভারতের প্রতিক্রিয়াশীল ব্রাহ্মণ্যবাদী চিন্তাভাবনার প্রচার চালানো, কথায় কথায় রামায়ণ-মহাভারতের মধ্যে বিজ্ঞানকে খুঁজে বের করার হাস্যকর প্রচেষ্টা ইত্যাদির ফলে সন্দেহ থেকেই যায় যে কলা আর বিজ্ঞানকে নিয়ে যে পাঁচমিশুলি তৈরীর প্রস্তাব এখানে দেওয়া হয়েছে সেখানে বিজ্ঞানের অনুপাত কতটা থাকবে ! দেশের পড়ুয়াদের উচ্চশিক্ষা আর চাকরি সুনিশ্চিত করার বদলে উল্টে 'বিশ্বমানের শিক্ষা' আর স্বায়ত্তশাসনের নাম করে ২০% পর্যন্ত বিদেশী শিক্ষক নিয়োগ এবং ২০% পর্যন্ত বিদেশী পড়ুয়া ভর্তি নেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলোকে। শিক্ষার বাজারকে আরও উন্মুক্ত করে দিয়ে বিশ্বের ২০০ নামীদামী প্রতিষ্ঠানকে ভারতের মাটিতে নিজেদের শাখা-ক্যাম্পাস খোলার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই এইসমস্ত প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনার খরচ কিরকম হবে সেটা ভারত সরকারের এক্তিয়ারের বাইরে থাকবে এবং কেবলমাত্র বিত্তশালী অভিজাত পরিবারের সন্তানেরাই এখানে শিক্ষা 'কিনে' নিতে পারবে। স্বায়ত্তশাসনের নামে বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজগুলোতে একদিকে পড়ুয়া এবং অন্যদিকে বেতনপ্রাপ্ত কর্মীদের অবাধ শোষণের রাস্তা খুলে দেওয়া হয়েছে। পড়ুয়ায়দের পড়ার খরচ, শিক্ষক ও অন্যান্য কর্মীদের বেতন, পড়ুয়াদের ভর্তি বা শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়াতে সংরক্ষণ কতটা মানা হবে বা না হবে ইত্যাদি সব সিদ্ধান্তই নেবে কর্তৃপক্ষ। সরকার কোনও কিছুতে হস্তক্ষেপ করবে না। বিশেষ করে সংরক্ষণ নীতি যে মানা হবেনা সেকথা বর্তমানে সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোতে SC/ST/OBC শিক্ষকদের নিয়োগ না হওয়া শূন্য পদগুলোর দিকে তাকালেই বোঝা যায়। একটা সমতামূলক ব্যবস্থা তৈরী করার বিপরীত পথে হেঁটে জাতি, ধর্ম, শ্রেণীভিত্তিক বৈষম্যকে টিকিয়ে রাখার যাবতীয় ব্যবস্থা করা হয়েছে এই নীতির মাধ্যমে।

উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে অনলাইন মাধ্যমের ব্যবস্থা ২০১৭ সাল থেকেই সরকার ধীরে ধীরে শুরু করে দিয়েছিল দেশীয় SWAYAM পোর্টাল এবং কোর্সেরা, উডেমি ইত্যাদি বিদেশী MOOC পরিষেবা দানকারী সংস্থার মাধ্যমে। সম্প্রতি সাতটা বিশ্ববিদ্যালয়কে সম্পূর্ণ অনলাইন ডিগ্রী প্রদান করার ব্যাপারে প্রথমবারের জন্য অনুমতি দিয়েছে ভারত সরকার। এতদিন শিক্ষানীতির খসড়ায় এনিয়ে কিছু বলা ছিলনা। কিন্তু এই বছরের গোড়াতেই নতুন শিক্ষানীতির আগের খসড়ায় সংযোজন করে অনলাইন শিক্ষার ব্যাপারে ঘোষণা করে দেওয়া হল। আর এরপর থেকেই বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মিডিয়ার খবরে দেখা গেল যে এই অনলাইন শিক্ষাকে কেন্দ্র করে আগামী ৪ বছরের জন্য ভারতে ১৫ বিলিয়ন US ডলারের ব্যবসা শুরু হয়ে গিয়েছে। করোনা পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে স্কুলগুলোতেও অনলাইন ক্লাস শুরু হয়ে গিয়েছে; এক শ্রেণীর পড়ুয়াকে বাদ রেখেই। স্মার্টফোনের অভাবে ক্লাস করতে না পেরে একাধিক পড়ুয়ার আত্মহত্যার মত মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে গেছে কেরল থেকে শুরু করে আসাম সমেত দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। কিন্তু এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতেও ব্যবসার লোভ সামলাতে না পেরে গত ১৩-ই জুলাই গুগল-এর CEO সুন্দর পিচাই ঘোষণা করে ফেললেন যে ভারতে ডিজিটাল ব্যবস্থার প্রসারে আগামী ৫-৭ বছরে তিনি ১০ বিলিয়ন ডলারের লগ্নি করবেন। অনলাইন শিক্ষার বিষয়ে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যাপারে সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশানকে (CBSE)-কে সাহায্য করবে ফেসবুক এবং গুগল। মজার ব্যাপার হল, এই অনলাইন শিক্ষার হঠাৎ উপর-মহলীয় চাপে UGC পর্যন্ত নিজের পুরোনো বিজ্ঞপ্তি লঙ্ঘন করে সম্পূর্ণ উল্টো পথে হেঁটে নতুন আদেশ জারি করল যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বাধ্যতামূলকভাবে UG এবং PG-র ফাইনাল পরীক্ষা নিতে হবে। স্বাভাবিকভাবেই, বর্তমান পরিস্থিতিতে অনলাইন পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে এবং অনলাইন পরিষেবা বিক্রীর ঝুড়ি নিয়ে ইতিমধ্যে কর্পোরেট সংস্থাগুলো নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু করে দিয়েছে। এদিকে পরিসংখ্যানের দিকে তাকালেই দেশের ডিজিটাল পরিকাঠামো আর অনলাইন শিক্ষার বেহাল দশার প্রকাশ্যে চলে আসে। দেশে এখনও ১৪৭০০ গ্রামে বিদ্যুৎ সংযোগ পৌঁছায়নি। দেশে কম্পিউটার এবং ইন্টারনেট দুটোই ব্যবহার করেন এমন জনগণের সংখ্যা মাত্র ৮%। দেশের ৩৭% পরিবার একটামাত্র ঘরের মধ্যেই পরিবারের সকলকে নিয়ে কোনওভাবে জীবন যাপন করে। অনলাইন শিক্ষার মাধ্যমে কর্পোরেট প্রভুদের ব্যবসা করার সুযোগ করে দিতে বর্তমান সরকার এতটাই উৎসুক যে তাতে যদি দেশের একটা বিরাট সংখ্যক পড়ুয়া স্কুলশিক্ষা বা উচ্চশিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হয় তাতেও এই সরকারের কিচ্ছুটি এসে যায়না।

মোদী ২.০-তে টুকটাক সরকারী সংস্থা বেচে দিয়ে বর্তমান সরকারের আর পেট ভরছেনা। তাই এবার এবার

গোটা শিক্ষাব্যবস্থাটাই কর্পোরেটদের কাছে বেচে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এতে একদিকে যেমন গরীব মেহনতী জনগণকে শিক্ষার আলো থেকে দূরে সরিয়ে রেখে তাদের সহজে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে, তেমনই কর্পোরেট নিয়ন্ত্রিত খবরের চ্যানেল, খবরের কাগজ ইত্যাদিও সরকারের সমস্ত পদক্ষেপে সরকারের গুণগানেই থাকবে মুখর। এই বিরাট শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইটা কোনও একক আলাদা লড়াই নয়। প্রতিটা ক্ষেত্রেই কর্পোরেট আগ্রাসনের প্রধান শিকার গরীব মেহনতী জনগণ। সুতরাং, কৃষিকাজের কর্পোরেটীকরণের বিরুদ্ধে লড়াই হোক বা শ্রম আইন শিথীল করে শ্রমিকদের চরম শোষণের বিরুদ্ধে লড়াই হোক বা স্বাস্থ্যক্ষেত্রের বেসরকারীকরণের বিরুদ্ধে লড়াই হোক বা শিক্ষাকে আলু-পটলের মতো বেচাকেনার ব্যবস্থায় পরিণত করার বিরুদ্ধে লড়াই হোক – শত্রুটা কিন্তু সেই একই। তাই এই লড়াইগুলোকে আলাদা আলাদা ভাবলে কোনদিনই এই বিরাট কর্পোরেট শক্তির বিরুদ্ধে জয়লাভ করা সম্ভব নয়। এই NEP ২০২০-এর ক্ষেত্রেও যতদিন না আমরা এইসমস্ত কথাগুলো শিক্ষাঙ্গণের বাইরে বেরিয়ে সরলভাবে সাধারণ মানুষের দোরগোড়াতে পৌঁছে দিতে পারছি, তাদের সমর্থন আদায় করতে পারছি ততদিন আমরা এই লড়াই জিততে পারবোনা। তাই এই মুহূর্তে এটাকেই আমাদের আশু কর্তব্য হিসাবে দেখা উচিত।

কেন আমরা এনআরসি-সিএএ-এনপিআর বিরোধী

সঞ্জীব কুমার আচার্য

একেবারে গোড়াতেই একটা বিষয় স্পষ্ট করে বলা দরকার যে আমাদের সংগঠন এপিডিআর গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, পশ্চিমবঙ্গ; অন্য অধিকার রক্ষার গণতান্ত্রিক সংগঠনের মতই এনআরসি-সিএএ-এনপিআর বিরোধী । আমরা এনআরসি-সিএএ-এনপিআর মানছি না। কিন্তু কেন এমন বলছি ? আমরা কি ভাজপার এই কর্মসূচিকে স্রেফ এই কারণেই বিরোধিতা করছি যেহেতু ভাজপা সাম্প্রদায়িকতার রাজনীতির সমর্থক? নিশ্চয়ই না! আমাদের অভিজ্ঞতা এবং বিস্তারিত পর্যবেক্ষণ ও সেই সাথে গভীর অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে আমরা নিশ্চিত যে এনআরসি-সিএএ-এনপিআর সর্বসাধারণের কোন কাজেই লাগে না এবং তা সর্বৈব জনবিরোধী যা আমরা বিস্তারিত আকারে সর্বসমক্ষে তুলে ধরছি। অনেকেই এটা "মুসলিমবিরোধী" শুধু এই বক্তব্য উপস্থাপন করেই বিরোধী অবস্থান গ্রহণ করছেন। এটা সত্যি হলেও এতে কিন্তু কখনোই সবটা বলা হয় না। কারণ ভারতের প্রতিটি নাগরিকই, সর্বমোট ১৩৭ কোটি জনগণের যে কেউ এর ফলে সম্ভাব্য বিপদের মুখোমুখি হতে বাধ্য। আসুন একটু বিশদ আলোচনায় প্রবেশ করি।

কেন্দ্রীয় সরকারের গেজেট বিজ্ঞপ্তি থেকে এটা স্পষ্ট যে, এনআরসি হলো প্রকৃতপক্ষে এন.আর.আই.সি। আসামের যে নাগরিকপঞ্জি হয়েছে তা আসলে ১৯৫১ সালের নাগরিক পঞ্জির পুনর্নবীকরণ মাত্র। কিন্তু বাকি সমগ্র দেশের জন্যই এনআরসি হলো প্রকৃতপক্ষে ২০০৩ সালের নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন মোতাবেকএন.আর.আই.সি । ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার ও সিএএ-র সমর্থকরা বোঝাতে চাইছেন যেন এটি নিছক একটি 'নাগরিকদের তালিকা' বই কিছুই নয়। এখানেই আমাদের প্রশ্ন সত্যিই কি এটা এতো সহজ ব্যাপার ? কিভাবে এই তালিকাভুক্তি ঘটবে ? সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন মেনেই তো তালিকা করতে হবে ! স্বাধীনতার পরে সংবিধান নাগরিকত্বের অনুমোদন সম্ভব করতো দ্বিতীয় অধ্যায়ের পঞ্চম থেকে একাদশ ধারা মেনে। যে নির্দেশিকায় ক)জন্মগত (by birth), খ) উত্তরসূরী (by descent), গ) পঞ্জিকরণ (by registration) এবং ঘ) আত্তীকরণের (by naturalisation) মধ্য দিয়ে নাগরিক হওয়া সম্ভব। ১৯৫৫ সালে উল্লিখিত নীতির ভিত্তিতে নাগরিকত্ব আইন সৃষ্টি হয়।

প্রথম নাগরিকত্ব আইন (১৯৫৫) এর তিন নম্বর সূত্র অনুসারে, যে কেউ যদি ভারতে জন্মায়, সেই ভারতের নাগরিক বলে স্বীকৃত হবে। খুবই সহজ প্রণালী এটি। অন্য কোনো শর্ত এখানে প্রযোজ্য নয়। ১৯৫৫ থেকে ১৯৮৬ পর্যন্ত এটি অবিকৃত ছিলো। সময়ের সাথে সাথে শর্তগুলি কঠোরতর হতে থাকে। পয়লা জুলাই ১৯৮৭ থেকে একটি নতুন শর্ত এর ওপর আরোপিত হয়। পিতা-মাতার একজনকে অবশ্যই ভারতীয় নাগরিক হতে হবে। ২০০৩ সালে শর্তটি আরো কঠিন হয়। হয় পিতা-মাতার উভয়কেই ভারতের নাগরিক হতে হবে অথবা একজন ভারতীয় নাগরিক এবং অন্য জন যেন অবৈধ আশ্রয়প্রার্থী (যিনি ভারতে আগন্তুক অথবা যার বৈধতার সময়কাল ইতিমধ্যেই উত্তীর্ণ) না হন। ২০০৩ এর আগে অবৈধ আশ্রয়প্রার্থীর ধারণা অনুপস্থিত ছিল। সেটি তখন থেকেই প্রচলিত হয়।

নাগরিকত্ব আইন ১৯৫৫ এর চতুর্থ সূত্র বলে উত্তরসূরি মাত্রেই ভারতীয় নাগরিক। যিনি ভারতের বাইরে জন্মেছেন

তার পিতা-মাতার একজন ভারতীয় নাগরিক হলেই তিনিও ভারতের নাগরিক হবেন।

পঞ্চম সূত্র মতে পঞ্জীকরণের মাধ্যমে নাগরিকত্ব অর্জনের ব্যাখ্যা আছে যে, সাত বছরের বেশি বসবাসকারী অভারতীয়ের নথিভুক্তির পরে নাগরিকত্ব অর্জনের আবেদনের অধিকার থাকবে (অবশ্য তার পিতা-মাতা বা কেউ একজন অবিভক্ত ভারতের নাগরিক বিধায়)। এখানেও ২০০৩ সালের পরে অবৈধ আশ্রয়প্রার্থী শব্দাবলীর অনুপ্রবেশ ঘটেছে। ষষ্ঠ সূত্রমতে কেন্দ্রীয় সরকার যেকোনো আবেদনকারীকেই স্বাভাবিকতার নিয়মে নাগরিকত্বের স্বীকৃতি দিতে পারে। কিন্তু এখানেও ২০০৩ এর সংশোধনীতে অবৈধ আশ্রয়প্রার্থীর বাধা সৃষ্টি করা হয়েছে। ২০০৩ এর সংশোধনীর মধ্যে দিয়ে আইন কঠোরতর করে বাছাই করার পদ্ধতি আরোপিত হয়। এত কিছুর পরেও নতুন আইন অনুযায়ী একজন বৈধ নাগরিকের নাম নাগরিকপঞ্জিতে জায়গা পাবে, এমনটা কি জোর দিয়ে বলা যায়? আমাদের উত্তর হল "না"!

আপনি হিন্দু বা মুসলিম যাই হন না কেন, আইন মেনে বৈধ নাগরিক হলেও, আপনার নাগরিকত্বের বৈধতা প্রমাণের জন্য উপযুক্ত নথির প্রয়োজনীয়তা সর্বাধিক। জাতীয় নাগরিক পঞ্জী নির্মাণের আসল উপলক্ষ্য কী -- এই প্রশ্নটি এড়িয়ে গিয়ে যদি আমরা জোর করেও ধরে নিই যে আসলে এটি একটি সহজ সরল নিয়মতান্ত্রিক কাজ তবুও দেখা যাবে যে নাগরিকত্ব প্রমাণের যথার্থ হাজির করা খুবই কঠিন একটি কাজ হয়ে দাঁড়াবে। আসামের ঘটনা বলি থেকে স্পষ্ট দেখা গেছে, যে কারো নাগরিকত্বের বৈধতা বাতিল করা কতটা সহজ। ফলে যেকোনো নাগরিককেই এই ফাঁদে ফেলে (প্রামাণ্য নথির অভাব -- সরকারি বয়ানে) অনাগরিক বানিয়ে দেওয়া খুবই সম্ভব।

আলোচনার সুবিধার জন্য, জন্মসূত্রের মাধ্যমে নাগরিকত্ব অর্জনের সহজতম বিষয়টিকেই ধরা যাক। ১৯৮৭ সালের আগে জন্মানো যেকোনো নাগরিককে শুধুমাত্র একটি প্রামাণ্য নথি দিতে হবে-- জন্মের শংসাপত্র। পঞ্চাশের বেশি বয়সী যারা , তাদের কাছে জন্মের শংসাপত্র থাকা সম্ভব ? কারণ ১৯৬৯ এর আগে ভারতে জন্মের শংসাপত্রের প্রচলনই ছিল না। তাছাড়া কজনই বা তখন হাসপাতালে সুব্যবস্থা য় জন্মানোর সুযোগ পেয়েছিলেন যাতে জন্মের শংসাপত্র পাওয়া যেত ? আজও বেশির ভাগেরই জন্ম হয় নিজ গৃহে। গ্রামীণ জনতার অধিকাংশ দূরত্বের কারণে হাসপাতালের সুবিধা থেকে বঞ্চিত। তবুও কেমন করে সব জেনে শুনেও প্রত্যেকের কাছে জন্মের শংসাপত্র চাইতে পারে? কোন যুক্তিতে?

যদি ধরেও নেওয়া যায় যে সকলেই এই শংসাপত্র পেয়েছেন, তবু কতজন তা রক্ষা করতে সক্ষম ? প্রান্তিক মানুষজন বন্যা, ঝড় অথবা রাজনৈতিক সংঘর্ষে প্রায়ই গৃহচ্যুত হয়ে পড়েন। ঘাটতি নেই মোটেও। কজনই বা মাধ্যমিকের দোরে পৌঁছে শংসাপত্রের দাবীদার হতে পারেন? সমস্যার এখানেই শেষ নয়। কষ্ট করে কেউ শংসাপত্র জামা দিলেও শংসাপত্রটি গ্রাহ্য নাই হতে পারে। এখানেই ফস্কা গেরো! বাছাই করার নিয়মাবলি অস্পষ্ট এবং যারা বাছাই করবে তাদের দক্ষতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা নির্ভরযোগ্য নয় । হতে পারে যে বিষয়টি ইচ্ছাকৃত ভাবেই ধোঁয়াশায় পরিব্যাপ্ত করা আছে, যাতে সুবিধামতো বাছাই সম্ভব। কে নাগরিক বলে স্বীকৃত হবেন আর কে নয় তার সবটাই অজানা। অন্তত আসামের ঘটনা উদাহরণ দিয়ে দেখা যায় যে বাবা-মা নাগরিক হয়েও সন্তান অনাগরিক, যেমনটা ছয় বছরের বোইআজার ক্ষেত্রে ঘটেছে।

আসামের বাইরের মানুষজনের মনে একটা ভ্রান্ত ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে যে, ১৯ লাখের বেশি মানুষ যারা অ-নাগরিক ঘোষিত হয়েছেন তাদের যথাযথ যোগ্যতা অথবা উপযুক্ত নথির অভাবের কারণেই এমনটা হয়েছে। এটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা! যাদের যোগ্যতা অথবা আদৌ বৈধ নথি ছিল না বা নেই, তারা কেন আগ বাড়িয়ে ভুল নথি পেশ করে নিজেদের বাড়তি সমস্যায় জড়াবেন ? তাই একমাত্র তারাই আবেদনের সাথে নথি জমা করেছেন যাদের বিশ্বাস ছিল যে তারা সহজেই বাধা পেরোতে সক্ষম হবেন ও তাদের স্বীকৃতি মিলবে । হয়েছে ঠিক উল্টো। ওঁদের পেশ করা নথিগুলি গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি।

উত্তরসূরীর প্রথায় নাগরিকত্বের নির্ণয়ের সমস্যা হলো আইনি নথি (legacy data) বাধা। এখানে সর্বৈব বিভ্রম। অসমের ক্ষেত্রে তবুও ভাগ্য সহায়ক ছিল কারণ ওদের জন্য এই ছেদবিন্দু টি হল ২৬শে মার্চ ১৯৭১ আর সারা ভারতের জন্য তা হল ১৯শে জুলাই ১৯৪৮ ফলে সমগ্র ভারতের জন্যই আমাদের পরাধীন ভারতে উপস্থিত হতে হবে আইনি নথি র দ্বারস্থ হতে। উত্তরসূরী অথবা নিবন্ধন উভয়ের ক্ষেত্রেই পূর্বপুরুষের ভারতীয়ত্বের প্রামাণ্যতা জরুরী। জমির খতিয়ান, ব্যাংক পাস বই, বাড়ির দলিল প্রভৃতি প্রামাণ্য বলে বর্ণিত। কথা হল কতজনের কাছে এমনতর নথি উপলব্ধ ? ১৯৪৮ সালে কতজনের ব্যাংক খাতা ছিল? বাড়িই বা ছিল কতজনের যার দলিল ছিল ? প্রায় অসম্ভব! হাজার বছরেরও বেশি সময় কোন পরিবার ভারতে বসবাস করেও এমনতর বৈধ নথি দেখাতে ব্যর্থ হতেই পারেন।

এন আর আই সি-র বর্তমান প্রণালীটি র লক্ষ্য স্বীকৃতি দেওয়ার বা অধিগ্রহণের নয় - বরং বাছাই বা অস্বীকারের । মূল অভীষ্ট হল নাগরিককে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করানো ও সম্ভবমত নাগরিকত্ব বাতিল করা। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও আরো বহু ভাজপা নেতাই বারে বারে চিহ্নিতকরণের পরে দেশ থেকে তাড়ানোর কথা

উল্লেখ করেছেন । নতুন আইনি নিয়মকে আশ্রয় করে চিহ্নিত করা ও বিতাড়নের হুমকির বাতাবরণ সৃষ্টিই হলো সার্বিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। তাই আমাদের বেশি বেশি জানা প্রয়োজন আইনের পরিবর্তন কোন মাত্রা পেয়েছে। না হলে ভুল ধারণা সৃষ্টি হবে যে নাগরিকত্ব আইন কেবলমাত্র নাগরিকত্ব দেওয়ার জন্য নির্মিত, নাগরিকত্ব প্রদানের উপায় মাত্র - কেড়ে নেবার তাগিদ থেকে নয়! আইনের চৌহদ্দিতে, বৈধ কাগজের উপস্থিতিটাই গ্রাহ্য। আসামের অভিজ্ঞতা স্পষ্ট করে দেয় যে ১৩৭ কোটি নাগরিকের যে কাউকেই এই আইনি প্রক্রিয়ায় নাগরিকত্ব থেকে বঞ্চিত করা যায়! তাই এটা শুধুমাত্র মুসলিম অভিবাসীদের জন্যই বিপদজনক এমনটা নয় । সমস্ত আদিবাসী, দলিত এবং মহিলারাও এই আইনে বিপদগ্রস্ত কারণ এদের কারো পক্ষেই নথি উপস্থিত করা সমস্যার। মুসলমানরা হয়তো লক্ষ্যমাত্রার প্রথমেই থাকবে কারণ হিন্দুরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার শর্তই হয়তো তাই হবে! কিন্তু বাকিরাও নিরাপদ নয়।

এন আর আই সির সম্পূর্ণতার পরে স্ত্রী –পুরুষ, ধর্ম বা শ্রেণি ,জাতি নির্বিশেষে যে বিপুল সংখ্যক মানুষ তালিকা বহির্ভূত হিসেবে আখ্যায়িত হবেন তাদের বলা হবে সন্দেহভাজন নাগরিক। তখন এঁদের বৈদেশিক ট্রাইব্যুনালের দ্বারস্থ হতে হবে। বহু টাকা খরচ করে , মাইলের পার মাইল দৌড়াদৌড়ি করে, দিস্তা দিস্তা কাগজ জমা করার পরেও নাগরিকত্ব প্রমানে ব্যর্থ হলে যেতে হবে নির্বাসনে (ডিটেনশন ক্যাম্প), নরকের অন্য প্রান্তে। জেল বা কয়েদখানাতেও কিছু ন্যূনতম সুবিধা থাকে আবাসিকদের, যেগুলো না পাওয়া গেলে অধিকারবলে বিচারব্যবস্থার দ্বারস্থ হওয়া যায়। কিন্তু এই নির্বাসন কেন্দ্রগুলোতে অবস্থা একদমই আলাদা কারণ এখানকার আবাসিকরা তো দেশের নাগরিকই নয় কিনা!

এন আর আই সি বা নথিভুক্তির সময় নানাবিধ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে প্রায় সবাইকে এটা প্রায় নিশ্চিত কিন্তু প্রশ্ন হল নথিভুক্তির কারনে কি বিন্দুমাত্র সুযোগ সুবিধার উন্নতি হতে পারে ? একদমই নয়, অন্ন-বস্ত্র, শিক্ষা- চিকিৎসা বা রোজগার এর ক্ষেত্রে কোন সুবিধা আদায় করে দেবে এই এন আর আই সি নথিভূক্তি ? কর্তৃপক্ষের উদাসীনতা আটকাবে ? এমনকি তালিকাভুক্ত হওয়ার মধ্য দিয়ে সমস্ত তালিকাভুক্ত নাগরিকগণ কি সব বিষয়ে সমান অধিকারের দাবিতে সক্ষম হবেন তাও কিন্তু নয়। তাহলে প্রশ্ন হলো নাগরিকত্বের স্বীকৃতিতে বাড়তি কি লাভ হবে যে প্রমানের কষ্ট মেনে নেবো ?

খুঁটিয়ে বিচার করলে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই যে এই এন. আর.আই. সি প্রক্রিয়ায় বহু মানুষকে বিপদের মধ্যে পড়তে হবে কিন্তু বাড়তি কোনো সুবিধা পাবে না কেউই। তাই মানুষের অধিকারের কথা ভাবলে , মানুষের ভালো যারা চাইবে তাদের এই এন. আর.আই. সি চালু করার বিরুদ্ধে দাঁড়াতেই হবে।

নাগরিকত্ব বিলের সংশোধনী (Citizenship Amendment Act) বা সংক্ষেপে CAA কেন বাতিল করতে হবে ?

২০০৩ সালের নাগরিক আইনের সংশোধনীতে সব ধরনের অবৈধ অনুপ্রবেশকারী এবং তাদের সন্তান-সন্ততিদের জন্য ভারতীয় নাগরিকত্ব অর্জনের সমস্ত রাস্তাই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। এই নিয়ে আতঙ্ক তৈরী হওয়ায় ২০১৯ সালের নাগরিক আইনের সংশোধনীতে (CAA) তে বিশেষ কিছু অবৈধ অনুপ্রবেশকারীর জন্য কিছু সুবিধা দেওয়া হয়েছে বলে একটা ধারণা তৈরির চেষ্টা চলে যে এই সংশোধনীর পর এন. আর.আই. সি চালু করার বিরুদ্ধে কারো কিছু বলার থাকতে পারে না। সত্যিই কি তাই ? কি আছে এই সংশোধনীতে ?

আমরা নাগরিকত্ব বিলের সংশোধনীকে বিরোধিতা করছি বা করে যাব! ডিসেম্বর ২০১৯ এ যে আইন সংশোধনী অনুমোদিত হয়েছে যাকে সংক্ষেপে সিএএ বলা হয়। ভাজপার নেতৃবর্গ মায় সংঘের প্রচারকরা মানুষের মধ্যে এই বলে প্রচার করছেযে, অবৈধ অনুপ্রবেশকারী অমুসলিমদের জন্য এটা এক রক্ষাকবচের কাজ করবে আর সংশোধনী বিলের বিভিন্ন ধারায় অ-মুসলিম জনতাকে ক্রমে ক্রমে নাগরিক করে নেওয়া হবে। এই প্রতিশ্রুতি বি.জে.পি - আর.এস.এস এর নগ্ন মুসলিম বিদ্বেষী লাইনের সাথে মিলে যায়। এর ফলে অমুসলিম ভোট বি.জে.পি র পক্ষে আরো ঝুঁকবে ভেবেই এই পরিকল্পনা। খোলাখুলি অ-মুসলমান জনগোষ্ঠীকে হয়রানি থেকে সরিয়ে রাখার ভান করা আর সরাসরি মুসলিমদের উপর অত্যাচার এর পক্ষে মদত দেওয়া! কিন্তু বাস্তব অন্যরকম কথা বলে। সিএএ অবশ্যই মুসলিম জনগোষ্ঠীর হয়রানির কারণ হবে কিন্তু তাই বলে অমুসলিম জনতাও হয়রানির হাত থেকে বাঁচবে না। মুসলিমদের বেশি হয়রানি ও অন্যদের কিছুটা কম এটাই ঘটবে বাস্তবে।

ভারতের বাইরে থেকে ইতিমধ্যেই ভারতীয় নাগরিক নন এমন যারা (উপযুক্ত পাসপোর্ট , ভিসা) সহ ভারতে আছেন তারা হলেন বৈধ অনুপ্রবেশকারী। ভিসার মেয়াদ ফুরোলে তাদের চলে যেতে হবে। কিন্তু ভারতীয় নাগরিক নন এমন যারা এদেশে বসবাস করছেন অথচ তাদের কাছে বৈধ নথি নেই তারা সরকারের ভাষায় অবৈধ অনুপ্রবেশকারী। ২০০৩ সালের নাগরিকত্ব আইনের সংশোধনীতে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল অবৈধ অনুপ্রবেশকারী এবং তাদের সন্তান সন্ততিদের জন্য ভারতীয় নাগরিকত্ব পাওয়ার সুযোগ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। CAA বা ২০১৯ সালের নাগরিকত্ব আইনের সংশোধনীতে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের দুটো ভাগে ভাগ করা হলো। অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের মধ্যে পাকিস্তান , বাংলাদেশ এবং আফগানিস্তান থেকে ভারতে আসা ৬টি বিশেষ ধর্মের

(হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ , জৈন , খ্রিষ্টান, এবং পারসী) মানুষদের আর অবৈধ অনুপ্রবেশকারী ধরা হবে না। এরা Passport Act এবং Foreigner's Act এর শর্ত পূরণ করলে এবং যদি তারা ২০১৪ সালের ৩১ শে ডিসেম্বরের মধ্যে ধর্মীয় অত্যাচারের কারণে ভারতে এসে থাকেন তবেই তারা বিভিন্ন ধারায় নাগরিকত্ব পাওয়ার জন্য আবেদন করতে পারবেন, (খেয়াল রাখতে হবে যে, এদের সরাসরি নাগরিকত্ব দেওয়ার কথা বলা নেই)। অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের মধ্যে বাকি যারা (তিনটি দেশ বাদে অন্য কোনো দেশ (শ্রীলংকা, ভুটান, মায়ানমার, নেপাল।....) থেকে আসা অথবা ওই ৬ টি ধর্মের বাইরে যারা (মুসলিম, ধর্মহীন) তারা অবৈধ অনুপ্রবেশকারীই থেকে যাবেন এবং নাগরিকত্ব পাওয়ার জন্য আবেদনও করতে পারবেন না।

১৯) সিএএ একদল মানুষকে - যেমন মুসলমান, বিধর্মী অথবা অন্যান্য অনেক (উল্লিখিত ছয়টি ব্যতীত) ধর্মাবলম্বী মানুষকে যেমন বৈষম্যের শিকার করছে - মাত্র ওই তিনটি দেশ বাদে অন্য সমস্ত দেশ থেকে আগত সব ধরনের মানুষের প্রতিও একই বৈষম্য সৃষ্টি করছে এই সংশোধনী! একদিকে বাংলাদেশ, পাকিস্তান বা আফগান মানুষদের সুযোগ দিতে পারলে শ্রীলঙ্কা, ভুটান, নেপাল অথবা মায়ানমার প্রভৃতি দেশের মানুষদের প্রতি এই বৈষম্যের কারণ কি? আসলে মৌলিক বিষয়টা হল হিন্দু জনগণের এক বিরাট অংশকে প্রকারান্তরে মুসলমান বিদ্বেষের আবহে কিছুটা ভাললাগার সুড়সুড়ি দেওয়া এবং সেই ফাঁকে মুসলিম বিদ্বেষী করে তোলা। তাই তো দেখি সরকারী প্রয়াসে ভান করা হচ্ছে যেন যে সমস্ত দেশে ইসলাম হল রাষ্ট্রধর্ম তারাই অত্যাচারী আর তাই ভাজপা বা সংঘ এই ঐস্লামিক অনাচারের বিরুদ্ধে মূর্ত রক্ষাকারী হিসেবে ধরায় অবতীর্ণ ও ইসলামাশ্রিত রাষ্ট্রগুলির ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নিপীড়নের বিরুদ্ধে বাস্তব ভূমিকা পালনে উদ্যমী। সত্যিই সেটা হলে সিএএ-তে কেন আহমদিয়াদের বিষয় নেই অথবা নেই ধর্মহীনদের কথা? মায়ানমারে মুসলিমরাও নিজ দেশে সংখ্যালঘু নিপীড়নের শিকার। একই ভাবে প্রচুর তামিল মানুষ শ্রীলঙ্কা থেকে উদ্বাস্তু হয়ে এদেশে আছেন। এঁরা কেউই কিন্তু বর্তমান সংশোধনীতে বিন্দুমাত্র লাভবান হবেন না। আসলে তেমনটা হলে তো আর 'মুসলিম তাস' খেলাটা জমে না। তাবৎ প্রয়াসের মূল উপপাদ্যই হল মুসলিম বিরোধী একটা বাতাবরণ সৃষ্টি করা।

সিএএতে এটা কিন্তু মোটেও বলা নেই যে অমুসলিম অভিবাসীরা আপনাআপনিই নাগরিকত্ব পেয়ে যাবেন। সিএএ'র অন্য বৈশিষ্ট্য হল যে 'অবৈধ অনুপ্রবেশকারী' বলে যাদেরই বলা হল, তাদের কাউকে 'নিজের' দেশে ফেরত পাঠাবার কোনো বন্দোবস্ত নেই। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সাথে আলোচনার সময় ভারতের প্রধানমন্ত্রী স্পষ্ট করেছেন যে সিএএ হচ্ছে ভারতের আভ্যন্তরীণ বিষয় এবং বাংলাদেশকে উদ্বাস্তু ফিরিয়ে নিতে হবে না। মুসলমান এবং অন্য যাদের 'অবৈধ অনুপ্রবেশকারী' বলে চিহ্নিত করা হল সবাই এই পর্যায়ে 'আটক ফাঁদ'এর (নির্বাসন) শিকার হিসেবে গ্রাহ্য হবেন। সুবিধাপ্রাপ্ত অভিবাসীরা নাগরিকত্বের আবেদন করতে সক্ষম পঞ্জীকরণের ভিত্তিতে বর্তমান সংশোধনীতে। সিএএ না হলেও যারাই ৭ বছরের বেশী এদেশে বসবাসকারী তাঁরাও নাগরিক হবার আবেদন করতে পারেন পঞ্জীকরণের মাধ্যমে। সুবিধাপ্রাপ্ত অভিবাসীরা হয়ত আটক ফাঁদ বা নির্বাসনে তখনই যাবেন না। কিন্তু তার মানে এও নয় যে তাঁদের নাগরিকত্ব আপনিই হয়ে যাবে। সরকারের হাতে ক্ষমতা থাকবে অন্যথা করার। মোদ্দা বিষয়টি হল মুসলিম ও অ-মুসলিমদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিভাজন রেখা তৈরী করা, যার একদিকে থাকবে নির্বাসনের আটক ফাঁদ আর অন্যদিকে থাকবে অনিশ্চয়তা। শাস্তির এই তারতম্যের মধ্যে দিয়েই আমজনতার কাছে বিষয়টির সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গী প্রক্ষিপ্ত হবে।

কেনই বা অ-মুসলিমদের জন্য অনিশ্চয়তা ?

সিএএ-তে এটা বলা আছে যে অমুসলিম অভিবাসীদের পঞ্জীকরণের আবেদনগুলি ভবিষ্যতে নিয়ম তৈরী করে তবে বিচার করা হবে। অর্থাৎ এখনই নিয়মগুলি গঠিত হয়নি। সরল সাধারণ মানুষজনকে বোঝানো হচ্ছে তাঁরা যেন নিজেদের ''অভিবাসী'' বলে স্বীকার করে নেন। যা আসলে "মৃত্যু পরোয়ানা"। একবার এমন স্বেচ্ছা ঘোষণা রাষ্ট্রের হাতে এসে যাওয়ার অর্থ হল ক্ষমতাসীন দলের স্থানীয় কর্তৃপক্ষ প্রভৃতির হাতের ক্রীড়নকে পরিণত হওয়া। ওরা যেমনটা খুশি করতেই পারে। নাগরিকত্বের আশায় আপনি নিজেকে "বিদেশী" বলে নিজেই উল্লেখ করতে বাধ্য হচ্ছেন!! পুলিশের ও সহজ টার্গেট হবেন ? আপনি নাগরিকত্ব পাবেন কিনা সেটা অনিশ্চিত হলেও যেটা অবশ্যই ঘটবে তা হল আপনার নিজেরই স্বীকৃতি যে আপনি অ-ভারতীয় অভিবাসী কেবল। হয়রানির শিকার যে হবেনই তার নিশ্চয়তা এভাবেই সৃষ্ট হচ্ছে। ফলে স্পষ্ট হচ্ছে যে শুধুমাত্র মুসলিম জনতাই এতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন - বিষয়টা তেমন নয় মোটেও। ভবিষ্যতে প্রতিবাদের জন্য পথে নামলে কালা আইনে আটক করার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা সর্বদাই মজুত থাকছে হাতে। সাধারণ মানুষকে এভাবেই নিয়ন্ত্রণে রাখার মহাকৌশল হল সিএএ, এনপিআর ও এনআরআইসি।

কতবার মানুষকে তার নাগরিকত্বের প্রমাণ দিতে হবে ?

'আধার' চালু করার আগে সরকার বলেছিল যে এটাই হবে পরিচয়ের মূল মানদণ্ড। একইভাবে ভোটার কার্ড প্রচলনের সময়েও সবাই বিশ্বাস করেছিল যে এটাই আইনি পরিচয় সাব্যস্ত হল। কারণ নির্বাচনী ব্যবস্থার নিয়মে সংবিধানের রীতি অনুসারে নির্বাচকরাই হলেন নাগরিক। আজ কিন্তু বলা হচ্ছে যে এগুলোর কোনোটাই বৈধ নাগরিকত্বের প্রমাণ নয়। তাহলে আজকের

সরকারী দাবিটাও যে ভবিষ্যতে একই কায়দায় অস্বীকৃত হবে না তারই বা কি নিশ্চয়তা? কতবার একই মানুষকে নিজেকে প্রমাণ করতে হবে!

আসামের বরপেটায় জনৈক শামসুল হকের নাম চারবার নথিবদ্ধ হয়েও বাতিল হয়েছে। প্রথমে তার নাম নাগরিকের তফশিলে ছিল না। তিনি বৈদেশশিক ট্রাইবুনালে লড়ে তা নথিবদ্ধ করেন। দ্বিতীয়বার তঁকে কাগজপত্র জমা করতে বলা হয় পরের বছরে। এভাবে চারবার পুনরাবৃত্তি ঘটে। আমার পরিচয়ের বৈধতার বিষয়ে একবার রাষ্ট্রকে নাক গলানোর সুযোগ দিলে রাষ্ট্রের হাতে সেটা বেশ মজাদার খেলনায় পর্যবসিত হয়ে আমাকেই ক্রীড়নক করে ছাড়বে শেষমেশ। NRIC আসলে অনেকটা মাছ ধরার ছোট ফুটোযুক্ত জালের মত। যাতে প্রথমে সব মাছই ধরা যায়। তারপর রাষ্ট্র বেছে বেছে কাকে রাখবে ঠিক করে বাকিগুলো জলে ফেলে দেবে । CAA ঠিক তেমনই বন্দোবস্ত। রাষ্ট্র কাকে কখন নিশানা করবে সেটা ওরাই ঠিক করবে।

এমনকি যারা নাগরিকত্ব পাবেন তাদেরও হয়রানি অন্যভাবে বাড়বে । যে কোন থানায় নালিশ জানাতে গেলেই যদি প্রথমেই থানার তরফে নাগরিকত্বের প্রশ্নটি সামনে নিয়ে আসেন তবে কেমন হবে? দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তির ক্ষেত্রেও ঠিক ঐ সমস্যা দেখা দিতে পারে বিমার সুবিধা নিতে। এভাবেই রাষ্ট্রের হাতে নাগরিকদের হয়রানী বাড়ানোর মত অস্ত্র সহযেই তুলে দেওয়া হবে। প্রশ্ন হল সেটা কি সুবিবেচনা প্রসুত হতে পারে?

CAA মেনে নেওয়া মানে সাম্প্রদায়িকতার পক্ষে যাওয়া:

ধর্মনিরপেক্ষতা র বদলে সাম্প্রদায়িকতাকে প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্য নিয়েই CAA র পরিকল্পনা । দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় এসে ভাজপা লুকোছাপা না করে সরাসরিই মুসলিম বিরোধিতার সুর চড়িয়েছে । ৩৭০ ধারা বাতিলের পরে, অযোধ্যার রামমন্দির তৈরী করা -- মুসলিম বিরোধীতার মাত্রা ক্রমশ বাড়াচ্ছে । আমরা যদি জ্ঞানত অথবা অজ্ঞানতাবসেই CAA র প্রতি সমর্থন দিয়ে বসি তবে সংবিধানের সেক্যুলার চরিত্রটির বদল ঘটানোর শক্তি ভাজপা বা সংঘকে জুগিয়ে দেব। এটি আসলে এক পরীক্ষা। এখন শুধুই কিঞ্চিত ঝাঁকুনি। পরেরবারে আসবে আঘাত। সেটাও সহ্য করে নিলে আসবে "হিন্দু রাষ্ট্র"। আমরা কি সবটাই মেনে নেব? ভারত সেক্যুলারপন্থী রাষ্ট্র গঠনে তৎপর হয় স্বাধীনতার পরে যখন পাকিস্তান ধর্মকে রাষ্ট্রের দিশায় তুলে আনে। স্বাধীনতার ৭০ বছর পরে কেন আমরা রাষ্ট্রের সেক্যুলার চরিত্রের বদল মেনে নেব? CAA কে মান্যতা দিলে এক মধ্যযুগীয় কুসংস্কারাচ্ছন্ন অযৌক্তিকতার কক্ষপথে দেশকে ঠেলে দেব! আমরা তো দাভোলকার, পানসারে প্রভৃতিদের ঘটনাগুলো জানি। ওঁরা যুক্তিবাদী ছিলেন বলেই নিহত হলেন। সংঘ পরিবার যৌক্তিকতার ধার ধারেনা কিছুতেই। বর্তমানে সংবিধান থেকে হয়তো তেমন কিছুই জোটেনি, কিন্তু যেটুকু আছে সেটাও শেষ হতে দিতে পারিনা। মধ্যযুগে ব্রাহ্মণদের পায়ের তলায় দাবিয়ে রাখা হত দলিত, শুদ্র ও মহিলাদের। আজকে NRIC-তেও জনতার ওই অংশটিই ফের সমস্যাদীর্ণ হতে বসেছে। আমাদের দেশের কোটি কোটি মহিলাদের কারোরই পিতৃপরিচয়ের স্পষ্ট প্রমাণ হাতে নেই, থাকা সম্ভবও নয়। বিবাহের পরে তাদের থাকে সামান্য বৈবাহিক পরিচয়। ঐ বৈবাহিক পরিচয়টা নাগরিকত্ব প্রমানে কোন কাজেই আসবে না বর্তমান আইনে। বিবাহের তিরিশ-চল্লিশ বছর পরে, কজনের কাছে পিতৃপরিচয়ের প্রামান্য নথি পাওয়া যাবে? নিজেদের 'অস্তিত্বের' (Legacy)ঠিকুজি কেমন করে তারা দেবেন? অসম্ভব কষ্টকর হবে সেটা। দলিতদের তো জমিই থাকে না। এবং আদিবাসীদের থাকেনা কোন দলিল। অল্প কিছু ক্ষেত্রে আদিবাসীরা যৌথ সম্পদের [জমির] অংশীদার হন। ব্যক্তিগত কখনই নয়। তাই তাদের পক্ষেও প্রমাণ দাখিল [legacy] অসম্ভব। অতএব ওদের জমিগুলি ছিনিয়ে নেওয়াটা খুবই সহজ হবে শুধুমাত্র ওদের অ-নাগরিক বানিয়ে। ছত্তিশগড় এবং ঝাড়খন্ডে কর্পোরেট জমি ছিনতাইয়ের বিরুদ্ধে ওঁরা লড়ছেন এই মূহুর্তে। এবার NRIC তাদের জমিগুলির হাতবদলের বন্দোবস্ত পাকা করে ফেলল।

আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু কারা?

তালিকাটা দীর্ঘ এবং সরকার চাইলে যে কাউকে শিকার বানাতে পারে। অবশ্যই মুসলিমরা হচ্ছে প্রথমতম লক্ষ্যবস্তু। দলিত আদিবাসী এবং মহিলারাও আছেন পর্যায়ক্রমে। একটা ব্রাহ্মন্যবাদী ধারণার তালগোল পাকানো সংস্করন হাজির করা হয়েছে। এই ধারার বিরোধীতা করলেই বিরোধীরা 'অ-নাগরিক' বলে ঘোষনা করা হতে পারে। সরকারের বিরোধীতা করলেও তিনি অস্তিত্বের সংকটের মুখোমুখি হয়ে পরতে পারেন। তার পরিচয়ে প্রশ্নচিহ্ন তুলে নাগরিকত্বের তালিকা থেকে সরিয়ে বৈদেশিক ট্রাইবুন্যালের বিচারে হেরে গেলে তাঁর জায়গা হবে "আটকখানায়"[Detention Camp] । অথচ আন্তর্জাতিক আইনে "আটকখানা"র অস্তিত্বই নেই কারণ কোন মানুষই বেনাগরিক হতে পারেন না আন্তর্জাতিক রীতি অনুসারে। প্রত্যেকেই কোন না কোন রাষ্ট্রের নাগরিক। যদি কোন দেশ কাউকে সেই দেশে থাকতে দিতে অস্বীকার করে তবে তাকে অবশ্যই নিজ দেশে [যে দেশের নাগরিক বলে আটক দেশ মনে করে] ফিরিয়ে দিতে বাধ্য। ভারতরাষ্ট্র যে সমস্ত মানুষকে নাগরিকের মর্যাদায় ভুষিত করতে অপারগ তাঁদের প্রত্যেকের 'আদি-নাগরিকত্বে'র বিষয়টি স্পষ্ট করার দায় কিন্তু বর্তাবে সেই ভারত রাষ্ট্রেরই কাঁধে যাতে করে তাদের "স্বদেশে" ফেরত পাঠানো যায়। অন্ততঃ আন্তর্জাতিক রীতি তেমনটাই বলে।

অথচ NRICতে এমন কিছুর উপস্থাপনাটুকুও নেই। কারো নাম নাগরিকের তালিকায় না পাওয়া গেলে সেই ব্যক্তিকে F.T তে গিয়ে সিদ্ধান্তের বিরোধ করতে হবে। দিনের পর দিন, মাইলের পর মাইল হেঁটে তাকে উকিলের পেছনে লাখটাকা খরচা এবং কাগজ পত্রের জন্য হাজার হাজার টাকা গুনাগার দিতে হবে, অন্য যাবতীয় দায় ঝেড়ে ফেলে। NRC তালিকা প্রকাশের পরে আসামে ৭০ জনের মত মানুষ মানসিক আঘাত সইতে না পেরে প্রাণ হারিয়েছেন। মাত্র তিন কোটি মানুষের জন্যই সরকারি ব্যয় হয়েছে ১৬০০ কোটি টাকা। আর সাধারণ মানুষের তরফে খরচা হয়েছে ৬৪০০০ কোটি টাকা। এসবের পরেও গৃহমন্ত্রী জানাচ্ছেন যে গোটাটাই হয়ত বাতিল হবে। কি চরম রসিকতা নাগরিকদের নিয়ে !

Detention Camp কেন ?

"আটকখানা'য় (Detention Camp) থাকার খরচার যোগান কে দেবে? সরকার তো বাজেট বরাদ্দ কমাচ্ছেন মিড-ডে-মিল বা NREGAয় । তাহলে কি কর্পোরেট সংস্থা মাগনায় অথবা নামমাত্র মূল্যে এদের শ্রমের সুযোগ নেবে ? মার্কিন দেশে এমনটাই প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে যে কর্পোরেট সংস্থার কাছে বন্দিদের কম পারিশ্রমিকে শ্রমদিতে বাধ্য করা হচ্ছে। আটকখানায় সস্তার বা বিনা মূল্যের মজুরের যোগান থাকলে কর্পোরেট বাইরে থেকে মজুর নেবে না বা মজুরি কমিয়ে দেবে। আটকখানায় পর্যাপ্ত শ্রমের যোগান ঘটলে মুক্ত দুনিয়ার বেকারী লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়বে লাগামহীন হয়ে।

NRIC আসলে জনতার বিরুদ্ধে এক যুদ্ধ। উন্নয়নের হার মাত্র ৪% । এই অবস্থায় প্রতিশ্রুতি ছিল ২ কোটি কর্মসংস্থানের, বদলে ইতিমধ্যে ৪০ লক্ষ কর্মের অবসান ঘটেছে । GST মধ্য ব্যবসায়ীর ওপর আঘাত হানছে। ব্যাঙ্কগুলি রাহুগ্রস্ত। কর্পোরেট দুনিয়া তাঁদের ঋণ কবে পরিশোধ করবেন তাও অজানা। এখন কর্পোরেটের নজর মধ্যবিত্তের সঞ্চয়ে । সার্বিক এমন পরিবেশে রাষ্ট্রের হাতে মানুষকে 'ত্রস্ত' করে রাখা ভিন্ন উপায় নেই। সেই কাজে NRIC সরকারের কাছে মোক্ষম কার্যকরী অস্ত্র। এ যেন সেই ছোটবেলার চোর-পুলিশ খেলা। 'পুলিশকে' ছুঁয়ে ফেললেই সে 'চোর' বনে গেল। সরকার জনগনকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে অপারগ আর নাগরিক যেমনি প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন অমনি রাষ্ট্রের তরফে নাগরিকত্বের প্রশ্ন এনে সব কেঁচিয়ে দিতে চাইছে। এটাই হল NRIC । এর মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রকে জিজ্ঞাসার অধিকার আমরা খুইয়ে বসব।

আমাদের তাই লড়তে হবে- NRIC, CAA, এবং NPR এর বিরুদ্ধে। NPR যে NRCর সাথে বাঁধা আছে এটা জানি আমরা। NPR এর নোটিশ জনগননা আইনের ধারায় দেওয়া হয়নি, হয়েছে নাগরিকত্ব আইন (২০০৩) এর IV A ধারায়। NPR এর মাধ্যমে তথ্যগুলি জড়ো করে সেসব NRIC র প্রথম পর্যায় তৈরি হবে। লক্ষনীয় যে আসামে NPR এর দরকারই নেই!? কারণ সেখানে NRIC হওয়ার কথা নয় । তাই NRC বা NRIC বিরোধীতার জন্যই আমাদের NPR এর বিরোধীতা করতেই হবে। আমাদের জনগনের কাছে পৌছে তাদেরকে বোঝাতে হবে যে এটা শুধুমাত্র মুসলিমদের হয়রানীর প্রশ্ন নয় কেবলমাত্র - এতে সমস্ত নাগরীকদেরই সংকটে ফেলা হচ্ছে যার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ লড়াই-ই একমাত্র পথ ।

ভারভারা রাও

তপতী চ্যাটার্জি

খুব কোলাহলের ভিতর নিঃসঙ্গ ঐ যে মানুষটি
অহরহ ব্লাস্টিং এর ভিতরেও ভ্রুক্ষেপ হীন
কিম্বা শেষতম প্রতিবাদ হয়ে ঐ শৃঙ্খলিত মানুষটি
আজীবন "শুভ সকাল" আঁকতে চেয়েছেন, একটি শুরু
যেখানে প্রতিটি মানুষ রাত্রির আহার শেষে ঘুমোতে যায়, স্বপ্ন দেখে
আসলে উনি একজন কবি
আর কবিকে ভয় পায় না
এমন কোন শাসক দেখিনি কখোনো
প্রসঙ্গত বলি, কবিকে ফাঁসিতে ঝোলালে
তাঁর কলমের মৃত্যু হয়না কোনদিন।

বজবজ পুরসভার চিত্রিগঞ্জে চিভিয়ট জুটমিলে মালিকের স্বেচ্ছাচারিতা :

মহেশতলা মেটিয়াবুরুজ শাখার সদস্যরা চিভিয়ট জুটমিলে মালিকের স্বেচ্ছাচারিতা ও শ্রমিক বিরোধী সিদ্ধান্তের কথা জানতে পেরে তথ্যানুসন্ধানে যান এবং জানতে পারেন যে, গত ২৬ শে মে বজবজ পুরসভার চিত্রিগঞ্জে চিভিয়ট জুটমিলের শ্রমিক রা কাজ করতে গিয়ে জানতে পারেন তাদের ৮ ঘন্টার কাজে ৭ ঘন্টার মজুরি দেওয়া হবে এবং কোন টিফিনের জন্য সময় দেওয়া হবেনা তখন শ্রমিক রা মিলের গেটের সামনে এর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখায়। ২৭ শে মে সকালে কাজে গিয়ে শ্রমিক রা দেখেন মিল বন্ধ করে দেওয়ার নোটিশ দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। তখন শ্রমিক রা আরো ক্ষেপে গিয়ে মিলের কর্তৃপক্ষের সাথে বাদানুবাদে জড়ান এবং কিছু ভাঙচুর করেন। বজবজ থানা থেকে বিশাল পুলিশ বাহিনী এসে লাঠি চার্জ করে বিক্ষোভ ভেঙে দেয়। সেদিন ই দুপুর বেলা শ্রমিক বস্তিতে পুলিশ এসে বস্তির ঘরে ঘরে ভাঙচুর করে আসবাবপত্র ফেলে দেয়। মহিলারাও রেহাই পাননি পুলিশের হাত থেকে। ১৪ জন শ্রমিককে পুলিশ ধরে নিয়ে যায়। এবং থানায় প্রত্যেকের কাছ থেকে ৮০০ টাকা করে নিয়ে সাদা কাগজে সই করে ছেড়ে দেয়। মূল আন্দোলন কারী জাকির কে খুঁজে পাওয়া যায় নি। এই শ্রমিকরা কেউ তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের সদস্য নয়। ইউনিয়নের নেতা এবং পুলিশ বলেছে যদি জাকিরকে পায় তবে কেটে গঙ্গায় ভাসিয়ে দেবে।

আমাদের শাখা থেকে এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করছি এবং পুলিশ কমিশনার দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, ডি এস পি, এবং মানবাধিকার কমিশনের কাছে চিঠি লিখে এদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ জানাচ্ছি।

সোনারপুরে পানীয় জল ও বিদ্যুৎ এর দাবীতে বিক্ষোভরত জনতার উপর পুলিশি নির্যাতনের প্রতিবাদ করায় এ পি ডি আর কর্মী সহ ১১ জনের গ্রেপ্তারের ঘটনা

গত ২৫/০৫/২০২০ তারিখ আনন্দবাজার পত্রিকায় "ফের বাধা দিলীপ কে, পথে মান্নান-সুজনও" শীর্ষক নিজস্ব প্রতিবেদনটি আশাকরি সকলেই পড়েছেন। প্রতিবেদনে লেখা হয়েছে "মানবাধিকার সংগঠনের সরোজ বসুকে হেনস্থা করার অভিযোগ উঠেছে। সরোজকে গ্রেফতারও করেছে পুলিশ।" ঠিক এটুকু পড়লে প্রকৃত ঘটনাটির গুরুত্ব বোঝা সম্ভব নয়। প্রকৃত ঘটনা সহ নাগরিক দের সামনে তুলে ধরতে গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি (এ পি ডি আর), সোনারপুর শাখার একটি তথ্যানুসন্ধান দল ঘটনাস্থলে যায় এবং ঘটনাক্রমের প্রকৃত তথ্য সংগ্রহ করে। তথ্যানুসন্ধান দলে ছিলেন সোনারপুর শাখার সদস্য দেবাশিস ভট্টাচার্য, অসীম পালিত, সুজয় ভদ্র, জগদীশ সরদার ও অজেয় পাঠক। এই দল ঘটনা সম্পর্কে যে প্রতিবেদন প্রস্তুত করেছে তা প্রকাশ করা হল।

গত ২০/০৫/২০২০ বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড় উমফুন এর তান্ডবে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণার প্রায় সমগ্র অংশ লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়। অসংখ্য গাছ, বিদ্যুতের খুঁটি পড়ে ও তার ছিঁড়ে প্রায় সমস্ত জেলা বিদ্যুৎবিহীন হয়ে যায়। দক্ষিণ ২৪ পরগণার সোনারপুরের বোসপুকুর অঞ্চলও দীর্ঘ সময় ধরে বিদ্যুতবিহীন এবং তার ফলে ঐ এলাকার বেশিরভাগ বাড়িতে পানীয় জলের সঙ্কট দেখা দেয়। এই বোসপুকুর অঞ্চলেই সোনারপুর সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক বা বি ডি ও এর দপ্তর এবং কোয়ার্টার অবস্থিত। পানীয় জল হল জীবনের আরেক নাম এবং বিদ্যুৎ ও পরিচ্ছন্ন পানীয় জল সকল নাগরিকের মৌলিক অধিকার, তাই পড়ে থাকা গাছ কেটে ও বিদ্যুতের খুঁটি সারিয়ে, বিদ্যুৎ-জল পরিষেবা চালুর দাবিতে গত ২২/০৫/২০২০ তারিখ সোনারপুর এলাকার কিছু ভুক্তভোগী মানুষ সোনারপুর বিডিও এর কোয়ার্টারে যান বিডিও-র সঙ্গে দেখা করে তাঁদের সমস্যার সমাধান চাইতে যান সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ ভাবে। তাঁদের দাবী ছিল বি ডি ও অন্তত একবার তাঁদের সমস্যাটা শুনুন। কিন্তু সোনারপুরের বিডিও তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে রাজি হন নি, এমনকি বহুবার ডাকা সত্তেও তিনি দরজা খোলেননি। সেদিন বেশ কিছুক্ষন ডাকাডাকির পর বাসিন্দারা চলে যান। পরের দিন অর্থাৎ ২৩/০৫/২০২০ তারিখও বিদ্যুৎ সংযোগ না আসায় তাঁরা বিডিও অফিসে যান, সেখানে জেনারেটর ও এসি চালু আছে জেনে টানা তিনদিনের জল-বিদ্যুতহীন বিধ্বস্ত বাসিন্দারা ক্ষোভে ফেটে পড়েন ও বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। বিক্ষোভের পুরোভাগে ছিলেন বোসপুকুর অঞ্চলের মহিলারা। বিডিও তখনও তাঁদের সাথে দেখা করেন নি, উল্টে তাঁদের শায়েস্তা করতে সোনারপুর থানায় ফোন করে পুলিশবাহিনী পাঠাতে বলেন। কিছুক্ষন পর সিভিক পুলিশের একটি দল এসে তাঁদের সেখান থেকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন, কিন্তু মহিলাদের প্রতিরোধের মুখে সিভিক পুলিশ রা পিছু হটে। এরপর এক বিশাল পুলিশ বাহিনী সেখানে এসে বি ডি ও এরই নির্দেশে, তাঁদের ঘিরে ফেলে এবং বিনা প্ররোচনায় প্রতিবাদরত মানুষদের বেধড়ক লাঠি দিয়ে মারতে শুরু করে। মহিলারাও

পুলিশি নির্যাতনের হাত থেকে রেহাই পান নি। মানবাধিকার সংগঠন "গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি" (এপিডিআর) এর সোনারপুর শাখার অন্যতম নেতৃত্ব সরোজ বসু সহ কিছু প্রবীণ নাগরিকরা এই পুলিশী বর্বরতার প্রতিবাদ করেন। বোসপুকুর অঞ্চলের এক যুবক এই পুলিশী বর্বরতার ছবি ও ভিডিও তুলছিলেন, তখন পুলিশের দুই-তিন জনের একটি দল যুবকটির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে নির্মম ভাবে মারতে থাকে। তখন সেই যুবককে বাঁচাতে গেলে সরোজ বসু কে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। উনি সোনারপুর শাখার সহ-সভাপতি। বিডিও অফিস চত্বর থেকে পুলিশ সরোজ বসু সহ আরও ১০ জনকে সোনারপুর থানায় তুলে নিয়ে যায়। সেখানেও তাঁদের উপর শারীরিক নির্যাতন চালায় পুলিশ। সরোজ বসু ছাড়া বাকিরা হলেন শঙ্কর ধর (৬৭ বছর), শুভজিত সেন (২৫ বছর), সমীর চক্রবর্তী (৬৭ বছর), পিনাকী চক্রবর্তী (৩৯ বছর), বিজয় সেন গুপ্ত (৫৬), শম্ভু মণ্ডল (৫৬ বছর) অমল কুমার মুখারজি (৬৭ বছর), অজয় মজুমদার (৫৭), সুমন পাল (৪২ বছর) এবং নিতাই চক্রবর্তী (৬৩ বছর)। তাদেরকে প্রাণে মেরে দেওয়া সহ নানারকম হুমকি দেয় পুলিশ। তাঁদেরকে যখন সোনারপুর থানায় আটকে রাখা হয়েছে, ঠিক সেই সময় নরেন্দ্রপুর থানার আরেকটি বাহিনী এসে মহিলা বিক্ষোভকারীদের উপর ব্যপক শারীরিক নির্যাতন চালাচ্ছে। সোনারপুর থানায় পুলিশের মারে আহত সরোজ বসু ও বাকিদের যখন ডাক্তারের কাছে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হলে, সেখানেও চিকিৎসকের সামনে এক অবাঙ্গালী পুলিশ অফিসার তাঁদের মেরে ফেলার হুমকি দেয়। প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে বিডিও পুলিশের কাছে একটি অভিযোগ জানায় যার মেমো নং ৩৫৬৭/এস এন বি, তারিখ ২৩/০৫/২০২০। সেখানে বোসপুকুর অঞ্চলের বাসিন্দাদের বিরুদ্ধে সরকারী সম্পত্তি নষ্ট, সরকারী কাজে ও ত্রাণ বিলিতে বাধা দান, আধিকারিক ও কর্মী দের গালাগালি দেওয়া, বিডিও কোয়ার্টর ও অফিসের কাঁচের জানালা ভাঙচুর, পুলিশের ভ্যান ভাঙচুর এবং সোনারপুর থানার আইসি কে মারধরের অভিযোগ আনেন সোনারপুরের বিডিও। এই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ১১ জনের বিরুদ্ধে এফ আই আর নথিভুক্ত করে। ঘূর্ণিঝড়ের পর রাজ্য সরকারের সার্বিক ব্যর্থতা ও অপদার্থতা ঢাকতে ঐ বিডিও এবং পুলিশ প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে সরোজ বসু সহ ১১ জনের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনে, কারণ তথ্যানুসন্ধান দল বিডিও অফিসে খুব সামান্য ভাঙচুরের চিহ্ন দেখতে পায়। বিডিও আবাসন এবং আই সি কে মারার অভিযোগ তো ডাহা মিথ্যা, উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে শাসক দলের নির্দেশে বিডিও এই ধরনের মনগড়া অভিযোগ এনেছেন। একই উদ্দেশ্যে, যাঁরা হিংসা থামাতে চেষ্টা করলেন, পুলিশ তাঁদের বিরুদ্ধেই গুণ্ডামি, সরকারী সম্পত্তি নষ্ট ও এমনকি খুনের চেষ্টার অভিযোগ এনে জামিন অযোগ্য বিভিন্ন ধারায় মিথ্যা মামলা সাজায়। পুলিশ যে সিসার লিস্ট প্রকাশ করেছে সেখানে ঐ প্রবীণ ব্যাক্তিদের কাছ থেকে পুলিশ নাকি প্রচুর ইট (৪৫ টি), বাঁশের টুকরো (১৫), হাওয়াই চটি (২৩টি), লোহার ডাণ্ডা (৫ টি) এবং বিডিও অফিসের জানালার ও পুলিশের গাড়ির ভাঙা কাঁচের টুকরো বাজেয়াপ্ত করেছে, সোনারপুর থানার জি ডি ১২২৭, তারিখ ২৩/০৫/২০২০ – এ তাই লেখা আছে। তথ্যানুসন্ধানকারী দল ঐদিন উপস্থিত বেশ কয়েকজন মহিলা ও পুরুষদের কাছ থেকে জেনেছে যে ঐ দিন সেখানে উপস্থিত বাসিন্দারা সম্পূর্ণ নিরস্ত্র ছিলেন। পুলিশ ও বিডিও সাধারণ বাসিন্দাদের সশস্ত্র দুষ্কৃতী বানিয়ে ফেলল! ঐ FIR এর সাক্ষী হিসেবে যাদের নাম আছে তারা হলেন এস আই প্রদীপ কুমার রায় ও অর্ঘ্য মণ্ডল, কন্সটেবল পঙ্কজ কুণ্ডু ও মুখতার আলি খান। লক্ষণীয়, সাক্ষীরা সবাই পুলিশকর্মী! হত্যার চেষ্টা, মারাত্মক ভাবে আঘাত করা, সরকারি কাজে বাধা দেওয়া প্রভৃতি বিভিন্ন ধারায় মামলা সাজিয়ে ২৪/০৫/২০২০ তারিখ বারুইপুর আদালতে তাদের পেশ করা হলে বিচারক পুলিশের এই মিথ্যা অভিযোগকে প্রাথমিক মান্যতা দিয়ে এই বোসপুকুরের নাগরিকদের ১৪ দিনের জেল হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন। গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে একজনের পরিবারের সদস্যরা স্থানীয় শাসকদল ঘনিষ্ঠ ও পুলিশের ঘনিষ্ঠ বারুইপুর আদালতের উকিল শান্তনু মণ্ডল কে এই মামলা লড়তে নিয়োগ করেন। এরপর ৩০/০৫/২০২০ তারিখ তাঁদের আদালতে তোলার একটি সম্ভবনা তৈরি হয়, সেইজন্য আমরা ঐদিন আদালতে উপস্থিত ছিলাম। ঐদিন উকিল শান্তনু মণ্ডলের থেকে মামলাটির ব্যপারে আমরা জানতে চাইলে সে তার দলবল নিয়ে আমাদের আদালত চত্বরেই আক্রমণ করে। সোনারপুর শাখার সম্পাদক এবং তথ্যানুসন্ধানকারী দলের সদস্য জগদীশ সর্দার কে শান্তনু মণ্ডল ও তাঁর পোষা গুন্ডাবাহিনী হিংস্রভাবে আক্রমণ করে। জগদীশ সর্দার প্রচণ্ড আহত হয় এবং তাঁকে হাসপাতালে পাঠাতে হয়। তাঁর শরীরের বিভিন্ন জায়গায় মারাত্মক চোট লাগে। ঐ দিন অর্থাৎ ৩০/০৫/২০২০ মামলাটি আদালতে ওঠেনি। এই ঘটনা প্রমাণ করে শাসক দলের মদতে উকিল শান্তনু মণ্ডল গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিদের মুক্তি পাওয়া আটকে রেখে তাঁদের পরিবারের কাছ থেকে আরও অর্থ উপার্জনের কৌশল নিয়েছিল। শাসক দল যে এঁদের মুক্তি আটকাতে চেয়েছে, তা প্রমাণ হয় তাদের মনোভাবে। যেমন এ পি ডি আর ১১ জনের মুক্তির দাবীতে পোস্টার লাগানোর পর সোনারপুরের তৃণমূল বিধায়ক আমাদের ফোন করে বলেন যে তাঁর মতে গ্রেপ্তার হওয়া ১১ জন মোটেও নিরাপরাধ নন! কিছু পোস্টার ছিঁড়েও ফেলা হয়। এরপর ০৩/০৬/২০২০ তারিখ মামলাটি আদালতে উঠলে আদালত ১১ জনের জামিন মঞ্জুর

করে ১০ হাজার টাকা ব্যক্তিগত জামিনের বিনিময়ে। ঐদিন এ পি ডি আর – এর সমর্থক আইনজীবীরা সওয়াল এ অংশ নেওয়ায় সেটা সম্ভব হয়। হামলা চালানোর জন্য আইনজীবী শান্তনু মণ্ডলের বিরুদ্ধে বারুইপুর থানায় লিখিত অভিযোগও জানানো হয়েছে। মুক্তি পাওয়ার পর জেলের ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা আমাদের জানান আমাদের শাখার সহ সভাপতি সরোজ বসু। তাঁর ভাষায় "Covid19, করোনা সংক্রমন কালে সোনারপুরে থানা ও বারুইপুর কারাগারে থাকার সংক্ষিপ্ত সময়ে 23/5/20--6/6/20 সব থেকে বিপজ্জনক ও মারাত্মক অভিজ্ঞতা হল সরকার এবং পুলিশ প্রশাসনের করোনা সংক্রমন স্বাস্থবিধী সম্বন্ধে উদাসীন পরিকল্পনা ও নিষ্ঠুর তামাশা.. শুধু যে ঘেষাঘেষি আর ঠাসাঠাসি আয়তনে বাসকরতে হয়েছে তাই নয় অসহায় বন্দিদের দিয়ে ফিনাইল ডেটল ছাড়াই ঘর বাথরুম পায়খানা প্রতিদিন পরিষ্কার করানো হয়েছে.. জেলখানার সমস্ত কাজই এখন অতি কম মজুরিতে বা নামজুরিতে করানো হয় এবং এই আদেশাবলী সবার জন্য বাধ্যতামূলক (বয়স অসুস্থতা ছাড়া).. আমরা 11জন এবং অন্যরাও ভীষণ দুশ্চিন্তায় ছিলাম, শুধু করোনা নয় নানাবিধ ব্যাকটেরিয়াল রোগ যেমন যক্ষাও সরকারি চরম অবহেলায় মহামারী হতে পারে.. ফাঁকিবাজি ফাজলামি বঞ্চনা ছলনা প্রতারণা কায়েদপুরীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে বহাল তবিয়তে আজও শক্তি বিস্তার করে আছে। কোনও শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখার মতো সুযোগ তো ছিলোই না তৎসহ একমাত্র একবার থার্মাল পরীক্ষা ও হাতে স্যানিটিজের মাখানো ছাড়া স্বাস্থ্য পরীক্ষার কোনোরকম ব্যবস্থা করা হয় নি.. আমাদের ভ্যাগ্য এবং ভগবানের ভরসায় ভাসিয়ে দেয়া হয়ে ছিল, আগামী দিনেও বন্দিদের সুরক্ষা বা নিশ্চিন্ত আশ্রয় পাবার কোনও সম্ভাবনা দেখতে পেলাম না. হাসপাতাল একটা আছে. ঔষধ ও ডক্টর ভাগ্যক্রমে পাওয়া যায়.. আমি সহৃদয় এক ডক্টর এর কৃপায় কিছু অতি প্রয়োজনীয় ঔষধ পেয়েছিলাম.. কিন্তু হাসপাতালে একসাথে নানাবিচিত্র রোগের রুগীদের মেঝেতে একটা পাতলা কম্বল পেতে পাশাপাশি সংক্ষিপ্ত ব্যবধানে শুতে হয়. যদি রোগ প্রতিরোধক শক্তি কম থাকে তাহলে খুব সহজেই এই চিকিৎসা ব্যবস্থা টি আপনার শরীরে নিশ্চিত নতুন ব্যাধি আমদানি করবেই.।" ১১ জনের বিরুদ্ধে পুলিশ এখনও মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করেনি। ঘূর্ণিঝড়ের পর রাজ্য সরকারের সার্বিক ব্যর্থতা ও অপদার্থতা ঢাকতে ঐ বিডিও এবং পুলিশ প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে এই কাজটি করেছে বলেই আমাদের ধারণা। পুলিশ ও সরকারের উদ্দেশ্য আতঙ্ক সৃষ্টি করে প্রতিবাদের কণ্ঠ রোধ করে দেওয়া, এই নির্লজ্জ প্রতিহিংসাপরায়ণতাই তার প্রমাণ। রাজ্যের মুখ্য প্রশাসক তথা মুখ্যমন্ত্রীর প্রত্যক্ষ নির্দেশেই এমনটা ঘটছে। এই ঘটনার পরে প্রতিহিংসাপরায়ণ সোনারপুরের বিডিও বোসপুকুর এলাকার জনগণের উপর প্রতিশোধ নিতে তাঁদের স্থানীও জলাশয়ে পৌঁছনোর রাস্তা টি বন্ধ করে বিডিও অফিস চত্বর পাঁচিল দিয়ে ঘেরার পরিকল্পনা নিয়েছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে এ পি ডি আর, সোনারপুর শাখা তাই দাবী জানিয়েছে-

১. বেআইনি ভাবে APDR সহ সভাপতি সরোজ বসু সহ ১১ জনকে গ্রেপ্তার করা এবং বিদ্যুৎ ও পানীয় জলের ন্যায্য দাবীতে আন্দোলনরত মানুষের উপর তীব্র রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের জন্য দায়ী সোনারপুরের বিডিও ও পুলিশ আধিকারিকদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে।

২. অবিলম্বে APDR সহ-সভাপতি সরোজ বসু সহ ১১ জনের উপর থেকে সমস্ত মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে।

৩. এলাকার জনগণের বিদ্যুৎ ও পানীয় জলের ন্যায্য দাবী কে পুলিশ দিয়ে দমন করা চলবে না।

৪. বিদ্যুৎ ও পরিচ্ছন্ন পানীয় জল সকল নাগরিকের মৌলিক অধিকার, একে হরণ করা চলবে না।

৫. বোসপুকুর অঞ্চলের মানুষের স্থানীয় জলাশয়ে যাতায়াতর রাস্তা অবরুদ্ধ করা চলবে না।

এ পি ডি আর, সোনারপুর শাখার পক্ষে
দেবাশিস ভট্টাচার্য, অসীম পালিত, সুজয় ভদ্র, জগদীশ সরদার

ধর্ষণের শিকার কুলতলির পঞ্চমশ্রেণির স্কুলছাত্রী

কাশ্মীরের আসিফা, উন্নাওয়ের মেয়েটি, গড়িয়ার সুলতানা থেকে শুরু করে সম্প্রতি কুলতলির পঞ্চমশ্রেণির স্কুলছাত্রী - এই একের পর এক ধর্ষণের ঘটনা বারবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় ধর্ষক প্রভাবশালী এবং শাসক শ্রেণির ঘনিষ্ঠ হলে তাকে সবরকম সুরক্ষা দেওয়ার জন্য প্রশাসন ঠিক কতদূর ব্যবস্থা নিতে প্রস্তুত।

সম্প্রতি কুলতলী থানা এলাকায় এমনই একটি ঘটনা সামনে আসে। কৈখালি এক নং গ্রামের ১২ বছর বয়সী এক স্কুলছাত্রীকে জোর করে তুলে নিয়ে গিয়ে দিনের পর দিন ধর্ষণ করে স্থানীয় তৃণমূল নেতা বাসুদেব মন্ডল। মেয়েটির বাবা নেই, মা কোলকাতায় কাজ করে। কৈখালিতেই দিদিমার বাড়িতে সে তার ছোটো দুই ভাইকে নিয়ে থাকে। তার দিদিমা যশোদা সরদারের সাথে কথা বলে গোটা বিষয়টি জানা যায়। তিনি জানান, গত ১৪ মার্চ রাত সাড়ে দশটা নাগাদ তার নাতনি অন্যদিনের মতো বাড়ির দাওয়ায় বসে পড়ছিল, তিনি ভেতরে দুই নাতিকে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। রাত ১১ টা নাগাদ বাথরুমে যাওয়ার জন্য উঠে তিনি দেখতে পান, নাতনি বাড়িতে নেই। এদিক

ওদিক খোঁজাখুঁজি করেন অনেক, নাম ধরে আশেপাশে অনেক ডাকাডাকি করেও তার কোনো সাড়া পাননি। অনেকক্ষণ পর টর্চ হাতে খুঁজতে খুঁজতে বাদাজমির দিকে গেলে দেখেন সে একা একা দাঁড়িয়ে কাঁদছে। বাড়ি নিয়ে আসার পর সে জানায়, প্রতিবেশী বাসুদেব মন্ডল তাকে মুখ চাপা দিয়ে জোর করে বাদার দিকে টেনে নিয়ে যায় ও ধর্ষণ করে। এবং শুধুমাত্র সেইদিনই নয় এর আগেও তিন-চার দিন অন্তর তাকে আরো কয়েকবার এইভাবে রাতে পড়ার সময় জোর করে তুলে নিয়ে যায় ও কখনো ছাদে, কখনো বাদায় ধর্ষণ করে। সে যাতে বাড়ির কাউকে কিছু না বলে তার জন্য বারংবার খুনের হুমকি দেওয়া হয়, এমনকি একবার হুমকির সাথে আরো ভয় দেখানোর জন্য জোরে তার গলাও টিপে ধরে। মেয়েটি ভীষণরকম ভয় পেয়ে যায়। প্রথমদিন ধর্ষণের পর তার অনেকটা রক্তক্ষরণ হয়, যন্ত্রণা করলেও সে হুমকির ভয়ে বাড়িতে কিছু বলতে পারেনি। কিন্তু ১৪ মার্চ বাড়িতে সবটা জানাজানি হওয়ার পর পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে শুরু করে। শুধুমাত্র অভিযুক্ত বাসুদেব মন্ডলই নয়, তার মা সন্ধ্যা মন্ডল ও গ্রামের আরো কয়েকজন নির্যাতিতা ও তার পরিবারকে দিনের আলোয় সবার সামনে হুমকি দিতে শুরু করে, কখনো "মাথার উপর ইঁট ফেলে মেরে দেবো" কখনো "ছোটো নাতিকে বালির বস্তায় পুরে মেরে দেবো" এমন নানানভাবে তাদের ভয় দেখাতে থাকে। নিগৃহীতার পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর জন্য তার স্কুলের শিক্ষক ও কয়েকজন যুবককেও প্রাণনাশের হুমকি দেয়। কুলতলি থানায় গত ১৫ মার্চ বাসুদেব মন্ডলের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ জানানো হলে থানা বিন্দুমাত্র সহযোগিতা করেনি। গ্রেফতার তো দূরের কথা, 'পেটি কেস' বলে এফআইআরটুকু পর্যন্ত নতিভুক্ত করেনি। দিদিমা বারবার অনুরোধ করলে থানার মেজোবাবু জানায় তিনি মেয়েটির দিদিমা নয়, তার মায়ের সাথে কথা বলবেন। দিদিমা তাকে জানান তার মেয়ে অর্থাৎ নিগৃহীতার মা এখানে থাকে না এবং মানসিকভাবে অসুস্থ, ফলে সে ঠিক করে বলতে পারবে না পুরো ঘটনাটা। তবুও থানা থেকে মেয়েটি ও তার দিদিমাকে বাইরে বসিয়ে রেখে তার মায়ের সাথে আলাদাভাবে কথা বলা হয়। মায়ের অজ্ঞতা ও অসুস্থতার সুযোগে থানা থেকে মুহুরি ডেকে ৪০০ টাকার বিনিময়ে অভিযুক্ত বাসুদেবের সাথে নিগৃহীতা নাবালিকা মেয়েটির বিবাহের চুক্তিপত্র লিখে তার মায়ের হাতে ধরিয়ে দেওয়া হয়। থানা থেকে কোনো সহযোগিতা না পেয়ে অভিযুক্তের শাস্তির দাবীতে এরপর দিদিমা বাড়ির দুটো ছাগল বন্ধক রেখে একহাজার টাকা দিয়ে স্থানীয় এক মহিলা সমিতির কাছে গেলে তারাও কোনো ব্যবস্থা নেয়নি।

এরপর নিগৃহীতার দিদিমা মানবাধিকার সংগঠন এপিডিআর এর সাথে যোগাযোগ করেন। এপিডিআর জয়নগর শাখা ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা কমিটির পক্ষ থেকে অভিযুক্তকে গ্রেফতার ও মেয়েটির নিরাপত্তার দাবিতে গত ৯ জুন বারুইপুর এসপি অফিসে ডেপুটেশন জমা দেওয়া হয়। অ্যাডিশনল এসপি মেয়েটি ও তার দিদিমার কাছ থেকে পুরো বিষয়টি শোনেন। এবং অভিযুক্তের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন। যদিও মেয়েটিকে আলাদাভাবে জিজ্ঞাসাবাদের সময় মহিলা অফিসার তাকে নানাভাবে জেরবার করেন। প্রথমবার জোর করে নিয়ে যাওয়ার পর পরের বারগুলোয় অভিযুক্ত জোর করেছিল নাকি নিগৃহীতা নিজের ইচ্ছায় গিয়েছিল - এমনসব প্রশ্ন করে চাপ সৃষ্টি করা হয়। মেয়েটি উত্তর দেওয়ার পরও বহুবার এই একই প্রশ্ন করে তাকে হেনস্থা করা হয়।

APDR এর স্মারকলিপির ভিত্তিতে বারুইপুরের অ্যাডিশনাল এসপি-র হস্তক্ষেপে পরদিন অর্থাৎ ১০ জুন কুলতলী থানার নাবালিকা ধর্ষণের ঘটনায় অভিযোগ (এফআইআর: Kultoli PS Case no. 232 of 10/6/2020) গৃহীত হয়। এবং দীর্ঘ তিন মাস টালবাহানার পর অবশেষে গ্রেফতার হয় অভিযুক্ত বাসুদেব মন্ডল।

নিয়মমাফিক মেডিকেল টেস্টের জন্য নিগৃহীতা মেয়েটিকে ঐদিন কুলতলি থানা থেকে নিয়ে যাওয়া হয় জয়নগর রুরাল হসপিটালে। এর পরের কতকগুলি ঘটনা নির্যাতিতা নাবালিকাকে আরও আতঙ্কিত করে তোলে। এবং একইসঙ্গে যেগুলি নিগৃহীতা মেয়েটির মানবাধিকার লঙ্ঘনের পক্ষে যথেষ্ট। টেস্ট হয়ে যাওয়ার পর নিগৃহীতা ও অভিযুক্তকে একই গাড়িতে করে ঐদিন থানায় ফিরিয়ে আনা হয়। এমনকি এই টেস্টের বাহানায় সারারাত মেয়েটি ও তার দিদিমাকে থানায় আটকে রেখে এই কেসের আইও অরুণ কুমার দাস দিদিমাকে দিয়ে কতকগুলি সাদা কাগজে সই করিয়ে নেয় এবং ক্রমাগত তাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করতে থাকেন । পরের বার এলে সাথে যেন দেড় হাজার টাকা নিয়ে আসেন ("আমার অনেক খরচ হয়ে গেছে") সেটাও জানিয়ে দেন! এছাড়া থানার আরো সাত জন পুলিশকর্মী নিগৃহীতার কাছে ঐদিনের ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ জানতে চায় বারবার। আবার নিগৃহীতার পরিবারের উপর চাপ সৃষ্টি করতে মেয়েটি ও তার দিদিমার সামনে অভিযুক্ত বাসুদেব মন্ডলের পরিবারের লোকজন বারবার স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে নিয়ে তদন্তকারী অধিকারিকের সাথে দেখাও করতে থাকেন। গত রাতের এই ভয়ানক আমানবিক পরিস্থিতির শিকার নাবালিকা মেয়েটিকে তার পরেরদিন অর্থাৎ ১১ জুন সকালে থানা থেকে নিয়ে যাওয়া হয় সোনারপুরের নবদিগন্ত হোমে।

নির্যাতিতার ওপর তদন্তকারী আধিকারিক সহ কুলতলী থানার এইসব অসহযোগিতা এবং অনিয়মের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ১২ জুন APDR দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা কমিটির পক্ষ থেকে বারুইপুর এসপির কাছে আবার

স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়। ঐদিন হোমে নিগৃহীতা মেয়েটির দিদিমা তার সাথে দেখা করতে গেলে হোমের ভারপ্রাপ্ত এক মহিলা তার সাথে ভীষণ খারাপ ব্যবহার করেন এবং দিদিমা মেয়েটির রিলিজের ব্যাপারে আবেদন ও সেই নিয়ে কথা বলতে চাইলে তিনি হোমের দরজাটুকু পর্যন্ত খুলে দেননি।

এরপর কোর্ট ডেট অনুযায়ী গত ২৩ জুন এই কেসের তদন্তকারী আধিকারিকের সাথে মেয়েটির দিদিমা বারুইপুর কোর্টে আসেন। পৌঁছনোর প্রায় আড়াই ঘন্টা পর কুলতলী থানার মহিলা কনস্টেবল নিগৃহীতা মেয়েটিকে সোনারপুর হোম থেকে কোর্টে নিয়ে আসে কিন্তু বারংবার কাকুতি-মিনতি সত্ত্বেও দিদিমার সাথে তার দেখা করার অনুমতি মেলেনি। নির্যাতিতা মেয়েটির গোপন জবানবন্দি চলাকালীন আই.ও কে মেয়েটির হোম থেকে রিলিজের বিষয়টি নিয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি CWC অফিসে রিলিজের একটা আবেদন পত্র জমা দেওয়ার পরামর্শ দেন। সেদিন অর্থাৎ ২৩ জুন নিগৃহীতার গোপন জবানবন্দি(164 ধারা অনুযায়ী) শেষ হলে দিদিমার সাথে দেখা করতে না দিয়ে সাথে সাথেই তাকে পুনরায় হোমে পাঠানো হয় এবং পরবর্তী শুনানির ডেট দেওয়া হয় ২৫ জুন যেদিন পকসো ধারায় মামলাটির ওঠার কথা এবং সেখানে নির্যাতিতার মায়ের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক বলে জানিয়ে দেন তদন্তকারী আধিকারিক।

পরবর্তী ২৫ জুন নির্যাতিতা মেয়েটির মা মাধবী সরদার কোর্টে উপস্থিত হলে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষার পর কোনো অজ্ঞাত কারণবশত সেদিন কোর্টের সকল শুনানি বন্ধ হয়ে যায়। এবং পরবর্তী শুনানির নির্দিষ্ট তারিখ দু সপ্তাহ পর ঠিক করা হবে বলে জানানো হয়।

এপিডিআর, জয়নগর শাখা:
মিঠুন মন্ডল, আরিফুল খান, শুভ্রর মল্লিক, আলতাফ আমেদ, সঞ্চিতা আলি

আম্ফানের ত্রান ও ত্রিপল বন্টনে স্বজনপোষন ও অনিয়ম :

মৌজা-রামরতনপুর, পো:-রামরতনপুর, গ্রাম পঞ্চায়েত-শ্রীনগর,থানা-হার্ডউড পয়েন্ট কোস্টাল, জেলা-দ:২৪পরগনা, ব্লক-কাকদ্বীপ, বিধানসভা-কাকদ্বীপ, লোকসভা-মথুরাপুর , সুন্দরবন পুলিশ জেলা-

গত ২৬/৬/২০২০-এ আম্ফানের ত্রান ও ত্রিপল বন্টনে স্বজনপোষন ও অনিয়মের অভিযোগকে কেন্দ্র করে শ্রীনগর পঞ্চায়েত অফিসে বিক্ষোভ ও উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।পাশাপাশি কয়েকটি গ্রামথেকে বহু মহিলা ও পুরুষ এই বিষয়ে প্রতিবাদ জানানোর জন্য সমবেত হয়। এই প্রতিবাদ চলাকালীন প্রতিবাদকারীদের সঙ্গে শাসকদলের বেশকিছু স্থানীয় নেতার বচসা ও পরে হাতাহাতি হয়।এমন সময় স্বাভাবিক ভাবে স্থানীয় থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রতিবাদকারী জনতার কথা না শুনে বেধড়ক লাঠিচার্জ করে ও জনতাকে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। এই প্রতিবাদকারীদের মধ্যে এক কলেজ, দু'জন বিদ্যালয় শিক্ষক ও একজন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ছিলেন। পুলিশের এই আচরণে উপস্থিত প্রতিবাদী জনতা হতবাক হয়ে যান! পুলিশ তাঁদেরকেও বেপরোয়া মারধোর করে, বলে গ্রামবাসীদের অভিযোগ। তারপর পুলিশ স্থানীয় নেতাদের সাহায্যে প্রতিবাদকারীদের বাড়ি চিহ্নিত করে,ও পাড়ায় বেশকিছুক্ষণ টহল দেয়।এর পর তিনজন প্রতিবাদীকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে থানায় যায়।এই তিনজনের মধ্যে একজন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ছিলেন, যিনি বাড়িতেই ছিলেন। তাঁকে কয়েকজন সিভিক গামছা পড়া অবস্থায় বাড়ি থেকে রাস্তায় এনে রাস্তাতে জামাকাপড় পরিয়ে থানায় নিয়ে যায়। এর পর পাড়ার মহিলারা পুলিশের এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করতে আসে। এই প্রতিবাদকারী মহিলাদের মধ্যে ঐ কলেজ শিক্ষকের মা, স্ত্রী ও সদ্য বিবাহিত বোন ছিলেন। জনৈক শাসকদলের নেত ভিড়ের মধ্যে থেকে পুলিশের উদ্দেশে বলেন,"এদের তিনজনকে তুলে নিন স্যার এরা অধ্যাপকের পরিবার"! যথারীতি ঐ শিক্ষকের মা, স্ত্রী ও বোন সহ পাশের বাড়ির আরো এক মহিলাকে জোর করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়।এরপর শাসক দলের বহু লোক এলাকায় জমায়েত করতে থাকে! পুলিশ দেখেও কিছু না দেখার ভান করে চলে যায়, বলে গ্রামবাসীদের অভিযোগ।

এই পুরো ঘটনাটি যখন ঘটছে তখন সময় আনুমানিক সকাল ১০টা হবে। দুপুর আন্দাজ ১.০০-১.৩০ নাগাদ ১৫০-২০০ লোক এদের অধিকাংশই অচেনা ঐ পাড়ায় ঢুকে পড়ে বাঁশ,লাঠি, লোহার রড নিয়ে! পাড়ার অধিকাংশ পুরুষেরাই তখন প্রাণ ভয়ে মাঠে বা ভেঙে পড়া পানের বাগানে লুকিয়ে থাকেন, জীবন বাঁচাতে। স্থানীয় একজন নেতার সঙ্গে উন্মত্ত বাহিনী পাড়ায় ঢুকে প্রতিবাদকারীদের বাড়ি ভাঙচুর , মহিলাদের উদ্দেশ্য কুরুচিপূর্ণ কথা বলতে থাকে। একজন যাটোর্ধ শিক্ষকে এমন মরা হয় যে তিনি সারাদিন পুকুরের জলে গা ডুবিয়ে বসে থাকেন, যন্ত্রনা থেকে রেহাই পেতে! ঐ কলেজ শিক্ষকের বাড়িও এরা ভাঙচুর করে! এইভাবে গ্রামে তান্ডব চালাবার পরে প্রতিবাদকারীদের খোঁজ চলতে থাকে মাঠে ও পান বরজে।ঐ কলেজ শিক্ষক কাছেই একটা পানের বরজে কোনো রকমে লুকিয়ে ছিলেন, কারন তাঁর একটি পায়ের লিগামেন্ট আগে থেকেই ছেঁড়া ছিল, তাই দৌড়ানোর ভয়ে লুকিয়ে ছিলেন। ওরা তাঁকে ধরতে প্রায় ৪০-৫০ জন পেছনে লাঠি নিয়ে দৌড়াতে থাকে। তারপর তাঁর পক্ষে আর দৌড়ানো সম্ভবনয় দেখে দাঁড়িয়ে পড়েন, ওরা তাঁকে মারতে থাকে। মা , স্ত্রী সহ বাড়ির মহিলারা এসে তাঁকে উদ্ধার করেন। এর পর ঐ বাহিনী

তাঁকে ওখানেই জোর করে বিচারে বসায় এবং বলে 'ত্রিপল নিয়ে প্রতিবাদ করেছো, তাই তোমাকেই সকলের ত্রিপল কিনে দিতে হবে'। জোর করে প্রানের ভয় দেখিয়ে একটি সাদাখাতায় ২৮০ টি ত্রিপলের কথা লিখিয়ে নেওয়া হয় এবং তাঁদের কাছে থাকা দুটি মোবাইল নিয়ে চলে যায়। এর পর গ্রামের ২০ জন প্রতিবাদকারীর নামে মিথ্যা মামলা করা হয়, যার মধ্যে তিনজন শিক্ষকও রয়েছেন (কেস নং-৯৭/২০)। পরে অবশ্য মোবাইল দুটি GD করে থানা থেকে ফেরত পান। তার পর থেকে বেশ কয়েকজন এখনো ঘর ছাড়া।এই ঘটনার পর থেকে প্রতিদিন রাতে-দিনে ৩০-৪০জন করে লোক পাড়াতে এসে হুমকি, মহিলাদের ভয় দেখানো সহ এলাকায় নিভৃত সন্ত্রাস সৃষ্টি করে চলেছে, বলে অভিযোগ। ঘটনার এক সপ্তাহ পর্যন্ত পাড়ায় রাতে পুরুষ শূন্য থাকে, ফলে মহিলা, শিশু ও বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা ভয়ে ভয়ে বাস করতে থাকে! এর পর ১/৬/২০২০, তারিখ সোমবার পুনরায় ১০০-১৫০ লোক ও শিক্ষকের বাড়িতে আসে ত্রিপলের খোঁজে! শিক্ষককে না পেয়ে আবারও আমার বাড়ি ভাঙচুর চালায়। তাঁর অসুস্থ মাকে শারিরীক ও মানসিক ভাবে অত্যাচার করে, স্ত্রীর উপর অত্যাচার কুৎসিত গালিগালাজ চলে ও প্রানে মেরে ফেলার হুমকি দেওয়া হয়, বলে অভিযোগ। এরপর বাড়ির মহিলারা থানায় ফোন করলে পুলিশ আসে এবং ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে, ঐ শিক্ষকের মা পুলিশকে অভিযুক্তদের নাম জানায় পুলিশ ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলে গেলেও কাজ হয়নি। পরে তাঁর স্ত্রী ও মা থানায় FIR করতে গেলে প্রায় ২ঘন্টা পর ডিউটি অফিসার এসে অভিযোগ নিয়ে একটা রিসিভ দেয়। এর দুদিন পর ওঁরা পুনরায় থানায় যান তখন থানার বড়বাবু শিক্ষকের স্ত্রীর সামনে তাঁর স্বামীর ব্যাপারে অনেক কুরুচিপূর্ণ কথাবলে এবং ভয় দেখাতে থাকে, যাতে FIR না করা হয়, এমন কি তাঁর চাকুরী খেয়ে নেওয়ার মতো হুমকি উনি দেন, বলে অভিযোগ।এর পর প্রথমদিনের রিসিভ কপি ও FIR এর প্রত্যায়িত নকল নিয়ে পুনরায় একটি স্লিপ দেওয়া হয়।যাতে একটা নং উল্লেখ রয়েছে(৯৭/২০) এই নং টি ২৬/৫/২০২০ তে প্রতিবাদকারীদের বিরুদ্ধে যে মামলাটি হয়েছিল তার FIR নং।যেটি বাস্তবে হাস্যকর ও প্রহসন। এর পর পাড়ায় বিভিন্ন ভাবে প্রতিবাদকারীদের হেনস্থা করা হচ্ছে।তাদের চাষ বন্ধের হুমকি দেওয়া হচ্ছে সরাসরি নয়, একটু ঘুরিয়ে অর্থাৎ যার হাল-ট্রাক্টর তাকে দিয়ে হাল বন্ধের হুমকি চলছে! এমনকি প্রতিবাদকারী পরিবারের অনেকেই সরকারী ত্রিপল ও আর্থিক সাহায্য পায়নি।বহু ক্ষতির সম্মুখীন তারা হলেও কেবল মাত্র প্রতিবাদ করার ফলে এরা হয়তো আম্ফানের সরকারী সাহায্য থেকে বঞ্চিত থেকে যাবে।গত ২৩/৬/২০২০ তারিখে প্রতিবাদকারীদের একজন নাম- বলাই পট্টনায়েক তার বাড়িতে সকাল আন্দাজ ৮.০০ নাগাদ বেশ কিছু শাসকদলের গুন্ডা চড়াও হয় এবং ওনার একমাত্র ব্যবহার্য শৌচালয় ভেঙে দিয়ে যায় এবং ব্যবহারের পুকুর ও ঘাট বন্ধকরার জন্য জালদিয়ে ঘিরে দিয়ে যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ওই পুকুরটি বলাই বাবু তার পিতার সময় থেকে ভোগ দখল করে আসছেন,এই পুকুর ও অন্যজমির কোনো বৈধ কাগজ ওনাদের কাছে নেই। পুকুরে বহু টাকার মাছ ছেড়েছেন।এতদিন এই পুকুর নিয়ে কোনো সমস্যা হয়নি বর্তমানে কেবল প্রতিবাদের অপরাধে ওনার শৌচাগার ও পুকুর ব্যবহার বন্ধ।এটা নিয়ে ওনার স্ত্রী থানায় ২৩/৬/২০২০ এ ঘটনা জানিয়ে একটি GD করেন(৮০৩/২০) এক্ষেত্রে ও পুলিশ নিরব। গত ২৭/৬/২০২০ বলাই বাবু পাশের একটি পাড়াতে ব্যবসায়িক কাজে যান। সন্ধ্যা আন্দাজ ৭.০০ নাগাদ ওনাকে শাসকদলের বেশকিছু নেতা জোর করে একটি ক্লাবে আটকে রাখে এবং ব্যাপক অত্যাচার চালায়। এবং প্রানে মারার হুমকি দেয়, কোনোক্রমে ওখান থেকে উনি পালিয়ে গিয়ে বেঁচে যান, বলে গ্রামবাসীদের অভিযোগ।

সমস্ত বিষয়টা জানিয়ে এপিডিআর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা কমিটির পক্ষ থেকে গত ১৮ জুন সুন্দরবন পুলিশ জেলার আধিকারিককে (এসপি) ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

আমাদের দাবি:

১) ত্রাণ দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিতে হবে।

২) প্রতিবাদী গ্রামবাসীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে।

৩) প্রতিবাদী গ্রামবাসীদের বিরুদ্ধে সামাজিক বয়কটের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিতে হবে।

৪) এলাকায় সুস্থ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় প্রশাসনকেই উদ্যোগ নিতে হবে।

এপিডিআর, ডায়মন্ড হারবার শাখা ও দক্ষিণ পরগনা জেলা কমিটির পক্ষে সাহানারা খাতুন, সানোয়ার লস্কর, গোপাল বিশাল, প্রবীর হালদার, বরুন দোলুই ও আলতাফ আমেদ।

আমফান বিধ্বস্ত দক্ষিণ ২৪ পরগনার খন্ডচিত্র

ভূমিকা:অতীতের সব ঝড়কে হার মানিয়ে দিয়ে আমফান ঝড় হয়।প্রায় ২০০ কিমির বিধ্বংসী গতিবেগ সম্পন্ন ঝড় চলে টানা ৮-১০ ঘন্টা।যার মধ্যে সর্বোচ্চ গতি নিয়ে ঝড় চলে প্রায় ৪ ঘন্টা। বিগত ২০০ বছরেও এমন ঝড় পশ্চিমবঙ্গে হয়নি বলে জানিয়েছে সংবাদ মাধ্যম। আমফান ঝড় মূলত পশ্চিমবঙ্গের ছয়টি জেলাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।এর মধ্যে মূলত দঃ২৪পরগনা, উত্তর২৪ পরগনা,পূর্ব মেদিনীপুর প্রধান।এছাড়া কলকাতা,হাওড়া,হুগলীর ও বিস্তির্ণ অঞ্চল ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

দঃ ও উঃ২৪পরগনা জেলার একটা বড় অংশ নদী উপকূলে হওয়ার ফলে এসব জায়গায় ব্যাপক বাঁধের ক্ষতি হয়, ক্ষতিকর আমফানের প্রভাবে। যার ফলে বহু মানুষের জীবন জীবিকা,ঘর,বাড়ি সব তছনচ হয়ে যায়। একে জনতার কার্ফু ও লকডাউনে কর্মহীন জীবন, তার মধ্যে আমফান ক্ষতির মাত্রাকে বাড়িয়ে তুলেছে। এখন এই ক্ষতিকে দু' ভাগে ভাগ করা যায়।

১.নদীর পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলোর ক্ষতি ও

২.নদী থেকে কিছু দূরবর্তী অঞ্চল গুলোর ক্ষতি।

প্রথম ক্ষতিতে বাঁধ ভেঙ্গে নদীর জল ঢুকে ঘর-চাষ সব নষ্ট করে দিয়েছে। ঝড়ে ঘর বাড়ি তছনচ হয়ে গেছে।পুকুরের মাছ নষ্ট হয়েছে, নদীর নোনা জল ঢুকে। মৎস্যজীবীদের নৌকা ভেঙ্গে গেছে। জল ঢুকে বহু পরিবারের খাদ্য সামগ্রী নষ্ট হয়েছে। বিপুল পরিমাণ গাছ ভেঙ্গে পড়েছে, যা প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় সমস্যা সৃষ্টি করবে। বিদ্যুৎ সংযোগ হয়েছে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত।

আর, দ্বিতীয়ত,নদী থেকে কিছু দূরের অঞ্চল গুলি যেখানে হেন কোন ও বাড়ি নেই যার ক্ষতি হয়নি।গাছপালা পড়ে নষ্ট হয়েছে পুকুরের জল।বিপর্যস্ত হয়েছে বিদ্যুৎ সংযোগ সম্পূর্ন ভাবে।

করোনার লকডাউন চলার ফলে এমনি ই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বহু মানুষের জীবিকা।তারপর দঃবঙ্গে ফিরেছে ব্যাপক সংখ্যক কর্ম হীন পরিযায়ী শ্রমিক। তার উপর চাপ বাড়ালো আমফান। বিপর্যস্ত হয়েছে দঃবঙ্গের জেলাগুলি।

আমরা APDR থেকে আমফান ঝড়ের পরের দিনেই পৌঁছে যাই কুলতলীও মৈপীঠ এলাকাতে। যদিও লকডাউনের সময় থেকেই চলছিল APDR এর নানা ত্রান কাজ।নদী উপকূলবর্তি কুলতলীর হাল ও এমন বেহাল।নদীর থেকে কিছু দূরে অবস্থিত অঞ্চল গুলিও ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।কিন্তু নদী না থাকায় ক্ষতির পরিমান টা এত দীর্ঘ সময়ের প্রভাব বিস্তারকারী হতে পারেনি।একদিকে ম্যানগ্রোভ অরন্য ধ্বংস হয়েছে অন্য দিকে নদীর নোনা জল বাঁধ ভেঙ্গে ঢুকে শুধু ঘর বাড়ি ভাসায়নি, ভাসিয়েছে বহু মানুষের জীবিকার একমাত্র স্থল কৃষি জমিটুকুও, যেখানে তিনবছর চাষ হবে না!

বহু মানুষের ঘর ভেসে গিয়ে সঞ্চিত খাদ্য ও নষ্ট হয়েছে।আবার লকডাউনের আগে থেকেই বনদপ্তরের বাধায় নদীতে নামতে পারছিল না জঙ্গলজীবি ও মৎস্যজীবীরা! আমফান তাদের নৌকা,ডিঙা তচনছ করেছে।দাদন নিয়ে যারা মাছ,কাঁঙড়া ধরে উপার্যনের কথা ভাবছিল তারা ও এখন গভীর আশঙ্কায় দিন কাটাচ্ছে।সূদ গুনতে হচ্ছে কর্ম হীন নিঃস্বহায় হয়ে।তাদের আর্থিক ক্ষতি শোধ হবে কি করে?কি করে আমফানে হারানো নৌকার ক্ষতি সামলে নতুন নৌকা নেওয়া যাবে?বহু চাষি সব্জি চাষ করেছিল লোন নিয়ে। সে সব ও এই ঝড়ে শেষ! আবার জঙ্গলের মধু ভেঙ্গে যাদের জীবন চলে সেই সব লোকজন ও মধু বিক্রি করতে পারেনি লকডাউন থাকায়। ফলে বাধ্য হয়ে কম দামে বা বীনা পয়সায় দিয়ে দিতে হচ্ছে মধু! তার মধ্যে লকডাউন থাকায় ও বনদপ্তরের নিষেধাজ্ঞায় নতুন করে জঙ্গলেও যেতে পারেনি তারা আবার শহরেও বিক্রি করতে যাওয়া যায়নি।অনেকে লোন নিয়ে প্রস্তুতি নেয় মধু ভাঙ্গার।সে অর্থ ও জলে চলে গেল।লোন কিন্তু গুনতে হচ্ছে।সাথে জলে গেল বহু পরিবারের ভবিষ্যৎ।প্রচুর ম্যানগ্রোভ অরন্য নষ্ট হয়েছে এখানে ঝড়ে।বহু গাছ পাতা সহ হোলদেটে হয়ে গেছে ঝড়ের পরে।যা চিন্তার বিষয়।সাথে বাঘ ও ঢুকছে লোকালয়ে এর বিপদ ও আছে।কয়েক দিন আগে দেউলবাড়ির চিতুড়িতে নদীতে কাঁকড়া ধরতে গিয়ে বাঘের কামড়ে মারা গেল একজন। ক্ষতিপূরণ এখন ও পায়নি।নোনা জল ঢুকে বিঘার পর বিঘা নষ্ট হয়েছে চাষ যোগ্য জমি।এখন সেখানে মিস্টি জলের পুকুরের মাছ,গাছ পচচ্ছে।আর এই পচনের দূর্গন্ধের মাঝেই ডাইরিয়া নিয়ে ঘর করতে হচ্ছে বহু অসহায় মানুষকে।আবার আমফানে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রায় মাসাধিক বিচ্ছিন্ন থাকায় এই লকডাউনের বাজারে অনেকখানি বিপর্যস্ত হয়েছে যোগাযোগ ও রিলিফের বিষয়।একসময় যখন বিদ্যুৎ সংযোগ ছিলো না কুলতলীর বিস্তৃর্ন অঞ্চলগুলিতে তখন সোলারেই ছিল নির্ভরশীলতা। দীর্ঘদিন সোলারের অভ্যাস বিদ্যুৎ সংযোগের ফলে ত্যাগ করায় পুরানো সোলার গুলো নষ্ট হয়ে গেছে।ফলে প্রবল সমস্যার মধ্যে পড়তে হয় কুলতলীর লোকজনকে।আর আমফানে সর্বত্রই বিদ্যুৎ সংযোগ ব্যাপক ক্ষতির সন্মুখিন হয়।আবার সকলের রেশন ও ভোটার কার্ড না থাকায় জোটে না পর্যাপ্ত রেশন ও।সাথে সরকারি ত্রান দূর্নীতি ও সন্ত্রাস তো ঝড়ের পর থেকেই শুরু হয়েছে।এই মোটামুটি আমফান বিধ্বস্ত কুলতলীর চিত্র।

ভৌগলিক বিবরন:-সুন্দরবনের নদী দিয়ে ঘেরা ছোট ছোট দ্বীপের সমবয় নিয়ে গঠিত হয়েছে কুলতলী।মাঝে কিছু সেতু দিয়ে যুক্ত হয়েছে এক দ্বীপ অন্য দ্বীপের সাথে।আবার কোথাও এখন ও সেতু হয়নি ফলে সমন্বয় ও হয়নি এক ভূ খন্ডের সাথে অন্য ভূ খন্ডের।জয়নগরের গা লাগোয়া এই কুলতলী জঙ্গল বেষ্টিত বঙ্গোপসাগর লাগোয়া নদী মাতৃক একটা বিস্তির্ণ এলাকা।কুলতলীর মধ্যে তিনটে থানার কর্তৃত্ব কাজ করে।কুলতলী থানা,মৈপিঠ কোষ্টাল পূর্ণভাবে আর আংশিক ভাবে জয়নগর- ২ এর সাথে যুক্ত অঞ্চলগুলিতে বকুলতলা থানার কর্তৃত্ব চলে।এছাড়া ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট আছে।কুলতলী বিধানসভার মধ্যে জয়নগর -২ ব্লকের চারটি অঞ্চল অবস্থিত। বাইশহাটা,নলগড়া,মনিরতট,চুপড়িঝাড়া।কুলতলী ব্লকের নয়টি অঞ্চল কুলতলী বিধানসভার অন্তর্গত।এই ব্লকের সবকটি অঞ্চল ই এই বিধানসভার অন্তর্গত।মেরিগঞ্জ-১,মেরিগঞ্জ-২,গোদাবর কুন্দখালি, গোপালগঞ্জ,জ্বালাবেড়িয়া-১,জ্বালাবেড়িয়া-২,দেউলবাড়ি, ভুবনেশ্বরী,মৈপিঠ এই অঞ্চলগুলি নিয়েই কুলতলী ব্লক। জয়নগর-২ ও কুলতলী দুই ব্লকের ১৩ টি

অঞ্চল নিয়ে গঠিত এই বিধানসভা।২০১১ সালের জনগননা অনুযায়ী কুলতলী ব্লকের জনসংখ্যা ছিল ২২৯,০৫৩ জন।যার মধ্যে পুরুষ ৫১%ও মহিলা ৪৯%।আর ৩৫ হাজারের কিছু বেশি ০-৬ বছর বয়সী শিশু ছিলো।

রিলিফের অভিজ্ঞতা:-কুলতলীতে মূলত ৬ টি অঞ্চল জুড়ে কাজ করা হয়েছে সার্ভে ও ত্রানের জন্য, APDRএর পক্ষ থেকে। মৈপিঠ, ভুবনেশ্বরী,দেউলবাড়ি,চু পড়িঝাড়া,বাইশ হাটা,গোপালগঞ্জ,নলগোড়া এই সাতটি অঞ্চলে কাজ হয়।যেগুলো যথাক্রমে এই অঞ্চলগুলি মৈপিঠ কোস্টাল,কুলতলী ও বকুলতলা থানার ভিতর পড়ে।এখানে দেউলবাড়ি অঞ্চলে প্রায় ৪ কিমি নদী বাঁধ ভাঙ্গন হয়।যা এই আমফান ঝড়ের সর্বোচ্চ নদী বাঁধ ভাঙ্গন। আশেপাশের ঘরবাড়ি ভেসে যায়।দু'শ টি পরিবার সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। স্থানীয় একজন তো জানান,'ঝড়ের দিন সকাল ৮ টা থেকে পরের দিন সকাল ৮ টা পর্যন্ত স্বপরিবারে এক হাঁটু জলে রাত কাটিয়েছি।সাইক্লোন সেন্টারে গেছিলাম কিন্তু প্রবল ভিড় দেখে চলে আসি।ঘর বাড়ি সব ভেঙ্গে তছনছ হয়ে গেছে।এখন খোলা আকাশের তলায় রাত কাটাতে হচ্ছে।'আর একজন স্থানীয় মানুষ জানালেন,'আমাদের ভোটার কার্ড,রেশন কার্ড নেই।এখানে ভোটার কার্ড,রেশন কার্ড পেতে গেলে ঘুষ দিয়ে, মামলা করেও লাভ হয়নি! আমার ছেলের বিয়ে দেব এখন ও ভোটার কার্ড হয়নি।

স্থানিয় লোকজনকে লকডাউনে আর্থিক ক্ষতি নিয়ে জানতে চাওয়া হলে জানায়,'আমরা মৎস জীবিরা নদীতে যেতে পারিনি।জঙ্গলে যেতে পারিনি।লোন নিয়েও শোধ করার মতন ক্ষমতা আমরা হারিয়েছি।' গ্রাম্য রাস্তার বেশির ভাগ এখন ও মাটির সে বিষয় জানতে চাওয়া হলে জানায় ,'এখানে এক রাস্তা বার বার অনুমোদন পেলেও কাজ আজ পর্যন্ত হয়নি।টাকা উঠে গেছে।'এক ঘটনা সরকারি ঘর ও পায়খানা পাবার প্রশ্নে হয়েছে বলে জানায়।তারপর ও যারা সরকারি ঘর পেয়েছে তাদের প্রচুর টাকা ঘুষ দিতে হয়, স্থানীয় শাসক দলকে। স্থানীয় স্বাস্থ্য কেন্দ্র বিষয় জানতে চাওয়া হলে জানায়,'দেউলবাড়ির কাঁটামারিতে দীর্ঘদিন ধরে পড়ে আছে স্থানীয় স্বাস্থ্য কেন্দ্র, বন্ধ অবস্থায়।কোন ও ডাক্তার,নার্স নেই।গ্রামের মানুষ অসুস্থ হলে ছুটে যেতে হয় অনেক পথ পেরিয়ে জামতলায় কুলতলি ব্লক হাঁসপাতালে।'শুধু কাঁটামারি নয় ,ভুবনেশ্বরি,মৈপিঠের বৈকুন্ঠপুরের স্থানীয় স্বাস্থ্য কেন্দ্রের বেহাল দশা।দরজা জানালা গুলো দীর্ঘদিন পরিচর্যার অভাবে ভেঙ্গে পড়ছে।

রেশন প্রসঙ্গে জানতে চাওয়া হলে নদীর আশেপাশের লোকজন জানায়,'রেশন যা পেয়েছিল তার অনেকাংশ আমফানে নদীর জল ঢুকে নষ্ট হয়ে গেছে।জমানো চাল ও খাদ্য দ্রব্য ও নষ্ট হয়ে গেছে।নোনা জল ঢুকে জমি ও নষ্ট হয়েছে।২-৩ বছর কোন ও চাষ হবে না।পুকুরের মিষ্টি জলের মাছ ও মারা গেছে নোনা জল ঢুকে।সাথে গাছপালা পড়ে পচছে পুকুরের জল।'আমফানের ফলে সরকারি ত্রান কেমন আসছে জানতে চাওয়া হলে, জানায়,'বাঁধের ভাঙ্গনের কাছে আসেনি কোন ও প্রশাসক।জয়নগরের এমপি এলেও নদী পথ দিয়ে হাত নেড়ে চলে গেছে।আমাদের কথা শোনেনি! প্রবল দলতন্ত্র চলছে।তৃনমূলের কুলতলীতে দুটো গোষ্ঠি।গনেশ ও গোপাল মাঝি।এরাই সব ত্রান ভাগ করে নিয়েছে এদের লোকজনকে দেবার জন্যে।সবাই পাচ্ছে না।' প্রথম সরকারি ত্রানের ত্রিপল ঢুকলে তা চুরি হয়ে যায় ওদিন রাত্রে বিডিও অফিস থেকে।এ নিয়ে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর ডেপুটেশন ছিল বিডিও তে।তাও জানায় এলাকাবাসী।

এর পর ওখানকার অসুখবিসুখ নিয়ে জানতে চাইলে ওঁরা জানান,'সুগার, প্রেশার,হার্টের সমস্যা ওখানকার মানুষের তেমন নেই।নোনা জল ঢুকে পুকুরের জল পচায় পেট খারাপ,ডাইরিয়া,স্কিন ডিজিজ হচ্ছে। এছাড়া বাঘ ও কুমিরের খাওয়া নিয়েও উদ্বিগ্নতা বরাবরের মতন আছে।'স্থানীয়রা আর ও জানায় 'আমফানের দিন নদীর নোনা জল বহু যেগায় ঢোকায় স্থানীয় কিছু ক্ষমতাসিন নেতারা পয়সা দিয়ে লোক লাগিয়ে যাতে জমি নষ্ট হয় ও ত্রান চুরি করে এই পরিস্থিতির সুবিধা নেওয়া যায়।'শুধু এই নয়, এর সাথে ত্রান নিয়ে দালালি, অসমবন্টন,দলতন্ত্র চলছে ব্যাপক ভাবে!

নদী ভাঙ্গন কুলতলীতে:- দেউলবাড়ির মাতলা নদীর পাশে চিতুড়িতে মাতলার প্রায় ৪কিমি।যেটা কুলতলীর সর্বাধিক নদী বাঁধ ভাঙ্গন।এরপর ভুবনেশ্বরীর হালদার ঘেরিতে ঠাকুরান নদীর পাশে প্রায় দেড় কিমি নদী বাঁধ ভাঙ্গন হয়।এছাড়া চুপড়িঝাড়ার ঢাকি তেও নদী বাঁধ ভেঙ্গেছে।ভুবনেশ্বরির মুন্ডা পাড়ায় ও ভেঙ্গেছে নদীর বাঁধ।নগেনাবাদ,অম্বিকানগর ও দক্ষিন বৈকুন্ঠ পুর মাতরি ও ঠাকুরাইন নদীর বাঁধ ভেঙ্গেছে মৈপিঠে।কৈখালিতে মাতলার নদী বাঁধ ভেঙ্গেছে। ভুবনেশ্বরীর গুড়গুড়াতে ও ভেঙ্গেছে নদীর বাঁধ।গোটা কুলতলীতে এরকম ছোট বড় অজস্র নদীর বাঁধ ভেঙ্গেছে।নলগড়া,গোপালগঞ্জ সহ আশেপাশের বহু অঞ্চলেই ভেঙ্গেছে কম বেশি নদী বাঁধ।স্থায়ি পরিকল্পনা করে নদী বাঁধ না দিলে এমন ভাঙ্গন প্রায়শই হচ্ছে।অতীত আয়লা,বুলবুল ঝড়ে ও ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে।আবার হলো।

ত্রান সামগ্রী:-APDR, জয়নগর শাখার পক্ষ থেকে সুন্দরবনের বিস্তৃর্ন অঞ্চল জুড়ে পর্যাপ্ত সার্ভে করে ত্রান দেওয়া হয়।সমুদ্র উপকূল ও সমুদ্র থেকে কিছু দূরের অঞ্চল গুলোতেও ত্রান দেওয়া হয়।সুন্দরবনে কুলতলী,জয়নগরের কিছু অঞ্চল,মৌসুমি দ্বীপে ত্রান ও স্বাস্থ্য শিবির করা হয়।

সুন্দরবন পুলিশ জেলার আম্ফান অধ্যুষিত এলাকায় ত্রাণ ও মেডিকেল ক্যাম্প করা হয়েছে এপিডিআর, ডায়মন্ড হারবার

শাখা ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা কমিটির পক্ষ থেকে।

এলাকাগুলো হলো: পাথরপ্রতিমা এলাকার বনশ্যামনগর দ্বীপ, মাধবনগর নামখানা এলাকার মৌসুনী দ্বীপ, পাতিবুনিয়া প্রভৃতি। ক্যানিং এলাকায় ও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, কিন্তু ত্রাণ দুর্নীতির জন্য ক্ষতিগ্রস্তরা সাহায্য পাচ্ছেন না। এখানকার শাসকদলের বাধায়!

আমফান বিধ্বস্ত মানুষদের দাবী:

আমরা জানি যে সাময়িক রিলিফ দিয়েই সমগ্র মানুষের স্থায়ি সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়।তবুও যতটা পারা যায় আমরা চেষ্টা করেছি।সরকারের দায়িত্ব এগুলো করা তারা তা যথাযথ ভাবে করলে অন্য কাউকে এ দায়িত্ব নিতে হতো না।আমফান বিধ্বস্তদের কিছু দীর্ঘমেয়াদি সমস্যা থেকে উদ্ভূত দাবী যেগুলো সামনে আসা দরকার সরকারের দৃষ্টিগোচর করার জন্যে--

১.নিয়মিত আমফান বিধ্বস্ত সমস্ত মানুষকে নিয়মিত রেশন দিতে হবে।

২.বিধ্বস্ত এলাকার ছাত্র ছাত্রীদের স্কুল কলেজের ফি মুকুব করতে হবে।

৩.বিদ্যুত বিল মুকুব করতে হবে বিপর্যস্ত এলাকার মানুষদের জন্যে।

৪.কৃষকদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

৫.মৎস্যজীবিদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, পারমিট থাক বা না থাক।

৬.সুন্দরবনে বাঘে খাওয়া পরিবার গুলোকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

৭.অবিলম্বে বাঁধ মেরামতি দ্রুত শেষ করতে হবে।

৮.ত্রান দূর্নীতি ও সন্ত্রাস বন্ধের জন্যে উপযুক্ত প্রশাসনিক পদক্ষেপ নিতে হবে।

৯.অবিলম্বে পর্যাপ্ত চিকিৎসক সহ বন্ধ হয়ে পড়া স্থানীয় হাসপাতাল গুলোতে পরিষেবা চালু করতে হবে।

১০.সুন্দরবন অঞ্চলে ফিরে আসা পরিযায়ী শ্রমিকদের বিকল্প কাজের ব্যাবস্থা করতে হবে।

১১. ১০০ দিনের কাজ নিয়ে শাসকদলের দূর্নীতি বন্ধ করতে হবে।

১২.আমফানে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ব্যাপক বনভূমি, তার পুনঃর্নিমানের ব্যবস্থা করতে হবে।

১৩. নোনাজল পরিস্রুত করতে নিয়মিত পদক্ষেপ নিতে হবে।

এপিডিআর, জয়নগর শাখা, এপিডিআর, ডায়মন্ড হারবার শাখা,
এপিডিআর, সোনারপুর শাখা,
এপিডিআর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা কমিটি।

সিথি থানায় পুলিশ হেফাজতে রাজকুমার সাউ-এর অস্বাভাবিক মৃত্যু

গত ১০/২/২০২০ তারিখে, সিথি থানায় পুলিশ হেফাজতে রাজকুমার সাউ-এর অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায়

১১/২/২০২০ তারিখে, APDRএর পক্ষে একটি তথ্যানুসন্ধানী দল ঘটনার তথ্যানুসন্ধানে যায়। সংগঠনের পক্ষে আলতাফ আহমেদ, নিশা বিশ্বাস, সোমনাথ মুখার্জি, শঙ্কর দাস, দেবাশীষ নন্দী ও দমদম অঞ্চলের সংগঠনের ৪ জন উৎসাহী সমর্থক সহ ৮ জনের প্রতিনিধি দল ঘটনার তথ্য সংগ্রহে প্রথমে চিৎপুর থানার অন্তর্ভুক্ত মৃত রাজকুমার সাউ, পিতা ঁ লক্ষীনারায়ন সাউ,১৩/১/১এ/এইচ-৬ রাজা মনীন্দ্র রোড, কোলকাতা -৩৭,থানা চিৎপুর, স্হিত বাড়িতে যাই। পোস্টমর্টেম শেষ করে রাজকুমার সাউ-এর মৃতদেহ নিয়ে আশার অপেক্ষায় এলাকার শতাধিক মানুষের ভিড়, ঘটনার আকস্মিকতা, পুলিশের অবাঞ্ছিত ক্ষমতার আস্ফালনের বিরুদ্ধে তাদের ক্রোধ ও শোকের যৌথ মূর্ছনা প্রকাশ পাচ্ছিল। শোকসন্তপ্ত পরিজনের কান্না ও হাহাকার গোটা অঞ্চলের মানুষের সম্মিলিত ক্রোধের অনুমান করে বিপুল পরিমানে পুলিশি তৎপরতা যেতে যেতেই নজর করা গিয়েছিল।

ভীড় কাটিয়ে আমরা মৃত রাজকুমার বাবুর বাড়িতে পৌছে জানা গেল পরিবারের সকল পুরুষ সদস্যরা তখন আর, জি, কর হাসপাতালের মর্গে। কথা বলার জন্য পরিবারের কয়েকজন মহিলা সদস্যা ও প্রতিবেশী মহিলারাই এগিয়ে এলেন। শোক স্তব্ধ মৃতার স্ত্রী বারবার কাঁদতে কাঁদতে মূর্ছা যাচ্ছিলেন। আমরা গোটা ঘটনার সবিস্তার বর্ণনা একে একে লিপিবদ্ধ করছিলাম।ইতিমধ্যে চিৎ পুর থানার IC অয়ন বাবুর নির্দেশে জনৈক SI শাকিল আহমেদ আমাদের জানালেন, এখানে কথা বলতে হলে আগে আমাদের মহামান্যা IC -র সাথে কথা বলতে হবে! আমরা খুব স্পষ্ট করে আমাদের পরিচয় ও ভিক্টিম পরিবারের সাথে আমাদের কথা বলার অধিকারে পুলিশি হস্তক্ষেপ মানব না, তা জানিয়ে দি।বাধ্য হয়ে শাকিল আহমেদ নামের ঐ অফিসার চলে যান।

পরিবারের সদস্যা প্রীতি সাউ আমাদের জানান সিথি থানার জনৈক সাব ইন্সপেক্টর মিস্টার এস,এন,দাস ১০/২ /২০২০ তারিখে সকাল ১১টা নাগাদ জিজ্ঞাসাবাদের নামে থানায় নিয়ে যায়।

জনানো হয় এলাকার কাগজ ও আবর্জনা কুড়ানি আসুরা বিবি নামের এক মহিলার স্বীকারোক্তি অনুযায়ী পুলিশ নাকি, চুরির মাল রাজকুমার বাবু কিনেছেন বলে জানতে পারে। প্রীতি আরও জানান গত

১৭/১/২০২০ তারিখে আবাসন প্রস্তুতকারি প্রোমটার জনৈক প্রদীপ পাল,পিতা -ঁগৌড় চন্দ্র পাল,৯/১ বনমালী চ্যাটার্জি স্ট্রিট,

থানা তালতলা, কোল-২ নিবাসী লিখিত আবেদন মারফত অভিযোগ করেন যে কোনো অপরিচিত অভিযুক্ত দ্বারা তার নির্মীয়মান ফ্লাট থেকে কয়েকশো কেজির কল, কলের ফিটিংস, পাথার ঘষা মেশিন ও সামগ্রী, গ্রীল তৈরির যন্ত্র ও যন্ত্রাংস সহ মোট ১৩ রকম সামগ্রী, যার আনুমানিক মূল্য ১লক্ষ১০০০০ হাজার টাকা। এই মর্মে /১৭/১/ ২০২০ তারিখে এস, আই- এস এন দাস একটি FIR লিপিবদ্ধ করে। প্রায় একমাস পর ঐ অভিযোগেই আসুরা বিবিকে আটক করে জিজ্ঞাসা করা হয়। এবং তার কথা মতই জিজ্ঞেসাবাদের নামে কোনো আইনানুগ নিয়মকানুনের তোয়াক্কা না করেই, কোনে নোটিশ বা অ্যারেস্ট মেমো ছাড়াই তাকে জোড় করে থানায় তুলে নিয়ে যায়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান এরপর জিজ্ঞাসাবাদ ও জোড় করে স্বীকারোক্তি আদায় এবং চুরি যাওয়া সামগ্রী কিংবা ১,১০০০০ টাকা আদায়ের জন্য চলতে থাকে অমানবিক শারীরিক নিগ্রহ। ফলে আগে থেকেই অসুস্থ ৫৫ বছর বয়সী পৌঢ় অচেতন হয়ে পরেন। থানায় উপস্থিত ভাই ও তার ছেলেরা তার ওষুধ দেবার জন্য অনুমতি চাইলেও কোনমতেই তাদের দেখা করতে দেওয়া হয়নি।

উপস্থিত সমবেত ভীড় সকলেই জানান স্বভাবে শান্ত, ও ভীতু রাজকুমার বাবু শুধুমাত্র কাগজ, প্লাস্টিকের জিনিসপত্রই কেনা-বেচা করতেন।তারা আরও সন্দেহ প্রকাশ করেন ধৃত অন্তঃস্বত্বা আসুরা বিবির পক্ষেও অত চুরির সামগ্রী বের করা সম্ভব নয়। যা সংবাদমাধ্যমের কাছে দেওয়া ভিডিও বিবৃতিতে তিনি ইতিমধ্যেই বলেছেন। আসুরা বিবি আরও বলেছেন পুলিশ জোর করে মিথ্যা কথা বলে রাজকুমার বাবুর দোকানে নিয়ে গিয়েছিল। যদিও আমরা কোনো ভাবেই আসুরা বিবির সাথে দেখা করতে পারিনি, পুলিশকে জিজ্ঞাসা করলেও তার কোনো খোজ পাওয়া যায়নি। তার এই আকস্মিক নিখোঁজ হয়ে যাওয়া, সমস্ত ঘটনায় পুলিশের ভুমিকাকে আরও সন্দেহের মুখে দাড় করে দিয়েছে।

ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করায় শাসক দলের হাতে আক্রান্ত 21 বছর বয়সী সৌমেন দাসএর মৃত্যু:

বেলঘড়িয়া নিমতা শাখার পক্ষ থেকে আমরা চার সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল বেলঘড়িয়া বাসুদেবপুর মধ্য পল্লি নিবাসী ২১ বছর বয়সী সৌমেন দাস, পিতা সুকুমার দাস দাসের বাড়িতে যাই। প্রতিনিধি দলে হিমাদ্রি ভট্টাচার্য্য, স্বপন দে, বাবলু ভৌমিক ও আমি(শঙ্কর দাস) ছিলাম। সংবাদে প্রকাশ গত ২ রা মে ২০২০ ওই এলাকার কয়েকজন যুবক তাদের নিজেদের স্বাধীন উদ্যোগে নিজেরা পয়সা জোগাড় করে এলাকায় করোনা পরবর্তী দুর্দশাকে মাথায় রেখে কিছু ত্রাণ সামগ্রী জোগাড় করে এলাকার দুঃস্থ মানুষদের মধ্যে বিতরণ করার চেষ্টা করে। কামারহাটি পৌরসভার 29 নম্বর ওয়ার্ডের জনৈক মহিলা কাউন্সিলর রুপালী সরকার তার কাজকর্ম দেখাশোনা করেন জনৈক অভয় তেওয়ারি এবং এলাকার তৃণমূলের কিছু সদস্য এসে ওই ত্রাণ কাজে বাধা দেয় এবং বলে তোদের ত্রাণ দিতে কে বলেছে সরকার মানুষকে বিনা পয়সায় চাল দিচ্ছে এবং আমরা প্রয়োজনমতো ত্রাণ দিচ্ছি তোরা দেবার কে? এই প্রশ্ন করার পর তারা ভিডিও তুলতে শুরু করে সৌমেন এবং তার বন্ধুরা ছবি তুলতে বারণ করলেও তারা ওই ছবি ওই ছবি সোশ্যাল মিডিয়াতে ছেড়ে দেয় এবং প্রচার করে রেশন কার্ড না থাকাতে একজনকে তারা নাকি ত্রাণ দিতে অস্বীকার করে এই ঘটনা ঘটার পর সৌমেন এবং কয়েকজন বন্ধু মিলে গত ৩ রা মে মাননীয় কাউন্সিলর রুপালী সরকারের অফিসে যান এবং কেন সেই ছবি পোস্ট হয়েছে সে কথা জিজ্ঞেস করেন কিন্তু রুপালী সরকার, অভয় তেওয়ারি কার্তিক দত্ত, কৌশিক দত্ত সৌমেন কে রাস্তায় ফেলে অত্যন্ত নির্মমভাবে মাটিতে ফেলে লাথি, ঘুষি ও ইট বাঁশ দিয়ে মারতে থাকে। ফলে সৌমেন দাস এর ঘাড় এবং স্পাইনাল কর্ডে মারাত্মক রকম আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে প্রথমে সাগর দত্ত তারপর আর জি কর এবং পরবর্তী সময়ে পিজিতে ভর্তি হন সংবাদ প্রকাশের পর আমরা আজ ওই এলাকায় গিয়ে করোনা পরবর্তী লকডাউনের সমস্ত সাধারন নিয়ম ও শারিরিক দুরত্ব বজায় রেখে সরোজমিনে ঘটনার অনুপুঙ্খ তথ্যানুসন্ধান করি। আমরা সুমনের মা, বাবা দিদি জামাইবাবু ও সৌমেন এর সঙ্গে যারা ওই ত্রাণকার্যে অংশগ্রহণ করেছিলেন তাদের কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলি। তারা সকলে জানান আজ পিজিতে সৌমেনের অস্ত্রোপচার হওয়ার কথা। ঘটনার ভয়ঙ্কর এবং অমানবিক হিংস্রতার কথা তারা সকলে তুলে ধরেন তারা অনেকেই একথা বলেন সৌমেন যেভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে তাতে ভবিষ্যতে সে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারবে কিনা তাতে সন্দেহ রয়েছে। এলাকার সাধারণ মানুষ স্বাভাবিকভাবেই ওই ঘটনার প্রেক্ষিতে উত্তেজিত হয়ে পড়েন এবং স্থানীয় রুপালী সরকার পরিচালিত পার্টি অফিসে ভাঙচুর চালান পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য এলাকায় পুলিশ এসে মানুষের উপরে অকথ্য আক্রমণ নামিয়ে আনেন এবং স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের নির্দেশে এলাকার সাধারণ মানুষদের মিথ্যে মামলায় জড়িয়ে দেন। ঘটনায় সৌমেনের পরিবারের তরফ থেকে এফআইআর করা হলেও রুপোলি সরকার, অভয় তেওয়ারি এবং অভিযুক্ত কৌশিক দত্ত, কার্তিক দত্ত সহ সকলেই জামিনে মুক্তি পেয়ে গেছেন উল্টোদিকে সৌমেনের বোন মুন্নি দাস কে তার দু মাসের বাচ্চা সমেত গ্রেফতার করা হয় এবং তার বোনের ননদ শম্পা বিশ্বাসকে পুলিশ গ্রেফতার করে এছাড়াও ওই ত্রাণকার্য অংশগ্রহণ করা সাধারণ কয়েকজন যুবক কেউ গ্রেপ্তার করা হয়। এমতাবস্থায় এলাকার সাধারণ মানুষের মধ্যে ঘটনার

পরিপ্রেক্ষিতে ভীষণ ভয় ও ক্ষোভের প্রকাশ আমরা দেখতে পাই।

আমাদের দাবি

১) সৌমেন এর উপর শারীরিক নিগ্রহকারী দোষীদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ধারায় মামলা করতে হবে।

২) সৌমেন ও তার পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

৩) সাধারন মানুষের উপর থেকে শাসকদলের অঙ্গুলিহেলনে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে।

৪) লকডাউন পরবর্তী প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ আধিকারিকদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে।

ASSOCIATION FOR PROTECTION OF DEMOCRATIC RIGHTS (APDR)
18, Madan Baral Lane, Kolkata 700 012
Email : dhiraj_sengupta@yahoo.co.in

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি (এপিডিআর), বেহালা শাখা
শখের বাজার সুপার মার্কেট, দ্বিতল
যোগাযোগ : 98302 56482

প্রতি,
Redressal Officer
CESC, South West Regional Office
P-18, Taratala Road
Kolkata 700 088

মহাশয়,

করোনা সংক্রমণের কারণে দীর্ঘদিন ধরে লক্ ডাউন চলছে। বহু মানুষের কাজ নেই। এর ওপর আম্পান আছড়ে পড়ায় মানুষ ভয়ঙ্কর আর্থিক সঙ্কটে পড়েছেন। এই অবস্থায় মিটার রিডিং নিয়মিত হয়নি। বিদ্যুতের গড় হিসেব কষে গ্রাহকদের বিরাট অংকের বিল কয়েক মাস ধরে পাঠানো হচ্ছে। বেহালা ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে বহু মানুষের বিদ্যুৎ বিলের পরিমাণ আগের তুলনায় প্রায় দুই/তিন গুণ বেশি এসেছে। ফলে বিপন্ন মানুষ এই বিলের টাকা সময় মতো দিতে পারছেন না। বিদ্যুৎ একটা জরুরি অত্যাবশ্যক নাগরিক পরিষেবা যা নাগরিকের অধিকার। এই পরিস্থিতিতে বিপন্ন মানুষের প্রতিকারের জন্য নির্দিষ্ট কয়েকটি দাবি রাখছি।

১) গড় হিসেব কষে পাঠানো বিরাট অংকের বিলের যুক্তিগ্রাহ্য অংশ মকুব করা হোক।
২) গ্রাহকরা যে বিল দিয়ে উঠতে পারেননি সেই বিল যাতে কয়েক দফায় দেওয়া যায় সেই জরুরি ঘোষণা অবিলম্বে করতে হবে এবং তার জন্য অতিরিক্ত চার্জ নেওয়া যাবে না।
৩) বিদ্যুতের ইউনিট প্রতি দাম যে হারে বাড়ানো হয়েছে তা অবিলম্বে কমাতে হবে।

সাধারণ নাগরিকের বিনা পয়সায় বিদ্যুৎ পরিষেবা কেন কোনো পরিষেবাই নেওয়ার মানসিকতা যেমন নেই তেমনি যে কোনো পরিষেবা যথাযথ মূল্যে পাওয়া নাগরিকের ন্যায়সঙ্গত অধিকার। কোনো অবস্থায় পরিষেবা পাওয়ার অধিকার থেকে নাগরিককে বঞ্চিত করা যায় না। সুতরাং নাগরিক স্বার্থে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন রাখছি।

ধন্যবাদে

স্বপ্না
এপিডিআর, বেহালা শাখা সম্পাদক
০২/০৭/২০২০

প্রতিলিপি :
১) মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
২) মাননীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রী, শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়

সংগঠন সংবাদ

এপিডিআর বেহালা শাখা:

বেহালা শাখার পক্ষ থেকে ৫ জুন ২০২০ বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করা হয়। প্রধানত জল-জমি-খনি-অরণ্যের ওপর কর্পোরেট আগ্রাসনের ফলে পরিবেশ ধ্বংস ও দেশের সম্পদ লুট হওয়া--- এই বিষয়টিসহ দু'-একটি অন্য বিষয় নিয়ে বেহালা চৌরাস্তার তিনটি স্পটে সদস্যরা জমায়েত হয়ে পোস্টার প্রদর্শনের মাধ্যমে এই কর্মসূচি পালন করে। তবে সদস্যদের অংশগ্রহণ কম ছিল। বলা বাহুল্য কারণও সঙ্গত। ওই একই বিষয় নিয়ে বরিশা হাই স্কুলের সামনে, চৌরাস্তা অটো স্ট্যান্ডে এবং সখের বাজারে পোস্টারিং করা হয়।

বেহালা ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে দু'-তিন মাস ধরে মোটা অংকের বিদ্যুৎ বিল গ্রাহকদের পাঠানো হচ্ছে। অনেকেই এই বিষয়টি আমাদের জানিয়ে কিছু করার কথা বলেন। আমাদের সদস্যদের অনেকের অভিজ্ঞতা একই। লকডাউনে কর্মহীন, আর্থিকভাবে বিপন্ন মানুষ বিদ্যুৎ বিল জমা না দিতে পারলে যাতে তারা এই নাগরিক পরিষেবার অধিকার থেকে বঞ্চিত না হয় এই লক্ষ্যে আমরা সিইএসসি সাউথ ওয়েস্ট রিজিয়নাল অফিসের রিড্রেসাল অফিসারের কাছে একটি দাবিপত্র পেশ করি (২/৭/২০) এবং এর প্রতিলিপি মুখ্যমন্ত্রী ও বিদ্যুৎ মন্ত্রীর কাছেও পাঠানো হয়।

গত ৪ জুলাই আমরা বিদ্যুৎ দপ্তরে দেওয়া দাবিপত্রটি প্রচার করি এবং ওইদিনই খাদ্য, স্বাস্থ্য ও ত্রাণের দাবি নিয়ে ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া প্রতিবাদী মানুষের ওপর পুলিশি নির্যাতনের ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে বেহালা চৌরাস্তায় পোস্টারিং করা হয়।

এরই মধ্যে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা গায়েবসহ দু'-একটি পারিবারিক নির্যাতনের ঘটনা শাখায় এসেছে। উদ্দিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে কথা বলা হয়েছে ও পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে আমাদের কোনো কোনো সদস্য দুর্গত ও বিপন্ন মানুষদের পাশে দাঁড়াবার বিভিন্ন উদ্যোগে শামিল হয়েছেন।

এ.পি.ডি.আর দক্ষিণ কলকাতা শাখা :

গত জুন-জুলাই - আগস্ট মাসে দক্ষিণ কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় পথসভা ও লিফলেট বিলি করার মধ্যে দিয়ে এলাকায় অধিকার লংঘনের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলার উপর জোর দেওয়া হয়। এর সাথে লক-ডাউন কে কাজে লাগিয়ে একের পর এক জনবিরোধী রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত ও যেকোন প্রতিবাদকে ভয় দেখিয়ে চুপ করে দেওয়ার রাষ্ট্রীয় চক্রান্তের বিরুদ্ধেও প্রচার চালানো হয়। একই স্তাহে এলাকায় প্রচারের সাথে সাথে জনসংযোগ ও সাংগঠনিক শক্তিবৃদ্ধির পরিকল্পনার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।

কর্মসূচি :

৩ রা জুন , যাদবপুর ৮ বি বাসস্ট্যান্ড বিষয় : ভারভরা রাও সহ সমস্ত রাজনৈতিক বান্দির মুক্তির দাবিতে পথসভা।

১৭ ই জুন , বাঘা যতীন মোড় , বিষয় : সোনারপুর শাখার সম্পাদক জগদীশ সরকারের উপর শাসক দলের হামলার প্রতিবাদে , বর্ণ -জাতি- সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছাড়ানোর বিরুদ্ধে, সমস্ত রাজনৈতিক বান্দির মুক্তির দাবিতে পথসভা।

২৩ শে জুন এলাকায় সুন্দরবনে M.K.P কর্মীদের উপর হামলা, দেগঙ্গায় আন্দোলনরত গ্রামবাসীদের উপর শাসক দলের হামলার প্রতিবাদে পোস্টারিং করা হয়।

২৮ শে জুন মিথ্যা মামলায় গ্রেপ্তার হওয়া দেগঙ্গায় আন্দোলনরত গ্রামবাসীদের মুক্তির দাবিতে বারাসাত কোর্টের সামনে জমায়াতে অংশগ্রহণ।

৭ই জুলাই গড়ফা পালবাজার অঞ্চলে সমস্ত রাজনৈতিক বান্দির মুক্তির দাবিতে পোস্টারিং।

২২ শে জুলাই সমস্ত রাজনৈতিক বান্দির মুক্তির দাবিতে যাদবপুর ৮ বি বাসস্ট্যান্ড এ পথসভা।

১৭ই অগাস্ট রুবির মোড়ে ডিসান হাসপাতালের অসুস্থ রোগীর সঙ্গে অমানবিক আচরণের জন্য শাস্তির দাবিতে পথসভা।

১৯ শে অগাস্ট গড়ফা পালবাজার অঞ্চলে প্রশান্ত ভূষণের আদালত অবমাননার অভিযোগ প্রত্যাহারের দাবিতে, লক-ডাউন সময়ে পুলিশের বেআইনি ও অমানবিক আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা।

বারাসত শাখা

(১) গত ২রা জুন APDR, উত্তর ২৪ পরগণার জেলা সমন্বয়ের পক্ষ থেকে বসিরহাট প্রস্তুতি শাখার সক্রিয় সহযোগিতায় হাসনাবাদ ব্লকের পাতলিখানপুর পঞ্চায়েতের টিয়ামারি গ্রামের বিস্তীর্ন অঞ্চলে উম্পুনে বিধ্বস্ত জলবন্দি মানুষের পাশে সহযোগিতার বার্তা দিতে ত্রান সামগ্রী নিয়ে তাদের পাশে থাকার সামান্য চেষ্টা করা হয়। গ্রামে পৌছে যেটা দেখা গেলো, বাঁধ ভেঙে মন্ডলপাড়া , টিয়ামারি সহ আশেপাশের কয়েকটি গ্রাম কার্যত জলের তলায়। অঞ্চলে তখনও পর্যন্ত কোনো সরকারি ত্রান পৌঁছয়নি। বাঁধ মেরামতির বিষয়ে সরকারি উদ্যোগেরও কোনো খবর নেই। গ্রামের লোকজন উদ্বিগ্ন, সামনের ৫ই জুন পূর্ণিমার ভরাকোটালে জল বেড়ে গেলে তাদের যে ভোগান্তি পোহাতে হবে সেই কথা ভেবে । আমরা গ্রামের মানুষকে আশ্বাস দিয়ে এসেছিলাম, বাঁধ মেরামতির বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে কথা বলব। ফেরার সময় আমরা পূর্তদপ্তরের ইঞ্জিনিয়ার এর সঙ্গে দেখা করে বাঁধ মেরামতির আবেদন জানাই । এই অঞ্চলে সরকারি ত্রানের ব্যবস্থা, বাঁধ মেরামতি ও নারী পাচার রোধে প্রশাসনিক ব্যাবস্থা গ্রহণ করার দাবিতে ৯ ই জুন উত্তর ২৪ পরগণার জেলা শাসকের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

(২) আম্পান বিধ্বস্ত মানুষের কাছে মানুষের পাশে:

১৪/৬/২০ এপিডিআর উত্তর ২৪ পরগণা জেলা সমন্বয়, এপিডিআর দক্ষিণ কোলকাতা শাখা এবং উত্তর পাড়া কোন্নগর শাখার একত্র উদ্যোগে আম্পান বিধ্বস্ত পার-হাসনাবাদের খাঁ পুকুর মৌজার হামগুড়া গ্রামের বিপন্ন মানুষের কাছে গিয়েছিল এইমুহূর্তের প্রয়োজনীয় কিছু সামগ্রী নিয়ে, যা ছিল প্রয়োজনের তুলনায় খুবই সামান্য। ঝড়ে ভেঙে পড়া ঘর, বাঁধ ভাঙা জলে সব ভেসে যাওয়া নিঃস্ব মানুষের কাছে সরকারের সামান্য চাল- আটাও যেখানে সময়ে পৌঁছায়নি সেখানে সাধারণ মানুষের মর্যাদার সাথে নিয়ে যাওয়া সামান্য সামগ্রীটুকু বিপন্ন মানুষ অত্যন্ত ভালো বাসায় গ্রহণ করেছেন। সহমর্মিতা উপলব্ধি করে তাঁরা তাঁদের বঞ্চনার কথা, যন্ত্রনার কথা সদস্যদের কাছে উজাড় করে বলেছেন -- ট্যাঙ্ক ফিসারির জন্য কী ভাবে মাঠের জল সরার খালের মুখ বন্ধ করে দিয়েছে, নোনাজলে মাঠ ডুবে থাকছে, গ্রাম ডুবে রয়েছে, কীভাবে এ বারের ধান চাষ নষ্ট হয়ে গেছে, বাবুদের ফিসারিজ থেকে কোটি কোটি টাকা কামানোর জন্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে চাষের জমি।

জব কার্ড আছে , বছরে১৫- ২০ দিনের বেশি কাজ হয় না।বহু মানুষ অন্য রাজ্যে কাজ করতে চান। ফাইবে পড়ে দীপ মণ্ডল। বোন পড়ে থ্রিতে। ঠাকুমার কাছে থাকে , তামিলনাড়ুতে বাবা গেঞ্জি প্যাক করে - মা উলের আসন বানায়। স্কুল বাড়িতে ৭০০ মানুষ রয়েছেন। কিন্তু মানুষ কীভাবে তার খাবারটুকুর ব্যবস্থা করবে !

দিতি বর মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে। বাবা কোলকাতায় কাজ করেন। উচ্চ মাধ্যমিক পড়বে কিন্তু গ্রামে উচ্চমাধ্যমিক স্কুল নেই। এই সব গ্রাম থেকেই শয়ে শয়ে মানুষ পেটের টানে শ্রমিক হয়ে পাড়ি দিচ্ছেন ভিন রাজ্যে। করোনা সংক্রমণে সেই শ্রমজীবী মানুষকে ঘরে ফেরার জন্য যে অমানবিক পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়েছে, তাঁরা আজ চাইছেন গ্রামেই থাকতে। কিন্তু রুজির কোনও সুযোগ নেই । তার উপরে আছড়ে পড়া আম্পানে মানুষের নিঃস্ব অবস্থা।

আপৎকালীন সরকারি ব্যবস্থা দুর্গত মানুষের নাগালের বাইরে।

তবু তুমল বৃষ্টিতে ভাঙা বাঁধের উপর কাদা জলেও বিপন্ন মানুষ অতিথিদের একটু চা দিতে ভুললেননা । হাত ধরে এক হাঁটু কাদা ভেঙে পরম যত্নে নৌকায় তুলে দিলেন কোনো প্রত্যাশায় নয়। শুধুমাত্র ভালবাসা আর বিশ্বাসে।

(৩) বারাসাত শাখা ৫ই জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবসের কর্মসূচি নিয়েছিল বারাসাতের আনন্দময়ী মোড়ে, সকাল সাড়ে দশটায়। পরিবেশ দিবসকে নিয়ে এ'বছরের বিশ্ব ভাবনা বা থিম হ'ল বায়োডাইভার্সিটি । সেখানে আয়োজক দেশ কলম্বিয়া বলছে,

> with one million species facing extinction, there has never been a more important time to focus on biodiversity.

পাঁচ বছর ধরে চলা যশোর রোডের জন্য আন্দোলন সেই জীববৈচিত্র্যের বিপুল ভান্ডার যশোর রোডের গাছের সারিকে বাঁচিয়ে রাখার কথা বলছে। সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে বিভিন্ন আদিবাসী ও বনবাসী জনগণের আন্দোলন বারে বারে বলে চলেছে পৃথিবীর যাবতীয় প্রাকৃতিক সম্পদ, আর তার জীববৈচিত্রকে রক্ষার কথা। বলছে মানুষের জীবন জীবিকা রক্ষার কথা। -- বাস্তুতন্ত্রের রক্ষার কথা। নোভেল করোনা ভাইরাস সংক্রমণের মূল কারণ হিসেবে বিশ্বের সর্বত্র পাহাড়, নদী, অরণ্য, জলাভূমি ধ্বংসকে চিহ্নিত করে, তাকে রক্ষা করার দাবিটিকে আজ সবার সামনে তুলে ধরছে।

ঠিক এর বিপরীতে, ভারত রাষ্ট্রের পরিবেশ তছনছ করা, পরিবেশ ধ্বংস করার ধারাবাহিক কাজগুলি নির্লজ্জভাবে আজও অব্যাহত। দেশজুড়ে লক ডাউনের এই সময়েও, আসামের দেহিং পাটকাই এ কয়লা খনি তৈরি এবং অরুণাচল প্রদেশের দিবাং ভ্যালিতে জলবিদ্যুৎ প্রকল্প গড়ার অছিলায় তারা প্রায় তিন লক্ষ গাছ কেটে ফেলার খেলা শুরু করে দিয়েছে।

পরিবেশ দিবসে বারাসাত শাখার কর্মসূচিতে এ'দিন বারে বারে স্লোগান উঠেছে -- যশোর রোডের গাছের সারিকে বায়োডাইভার্সিটি হেরিটেজ বলে ঘোষনার, প্রকৃতি-পরিবেশ জীবন-জীবিকার উপর কর্পোরেট ও রাষ্ট্রের মিলেমিশে আক্রমণের বিরুদ্ধে, গড়ে ওঠা আন্দোলনগুলির সাথে সমস্ত মানুষের অংশগ্রহণের, সমর্থনের আহ্বানে।

(৪) ১৩ই জুন, শনিবার বিকেল পাঁচটায় এপিডিআর, বারাসাত শাখা এবং অন্যান্য

গণ-সংগঠন বারাসাত কলোনি মোড়ে জড়ো হয়েছিল ভারত ও আমেরিকার প্রতিবাদী দলিত ও কৃষ্ণাঙ্গদের সমর্থনে। রাস্তার পাশে প্ল্যাকার্ড হাতে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে এক ঘণ্টা ধরে চলে স্লোগান ও সংক্ষিপ্ত বক্তব্য।

আমেরিকায় জর্জ ফ্লয়েড হত্যা তো আমাদের এই দেশে দলিত, মুসলমান মানুষের উপর ব্রাহ্মণ্যবাদীদের ঘৃণা, নৃশংসতা আর ঔদ্ধত্যেরই একটি প্রতিচ্ছবি। যেকোনো একটা অযুহাত তৈরি করে, "নিচুদের" কঠিন শাস্তি দিতে এখানে ঘটে চলে একের পর এক হিংস্রতা-গণপ্রহার-হত্যা।

তাই মিনেসোটা সহ পৃথিবীজোড়া 'ব্ল্যাক লাইভস্ ম্যাটার' আন্দোলনের ঢেউয়ের সাথে এখানকার প্রতিবাদে উঠে আসে ভীমা-কোরেগাও, কালাহান্ডির নিপীড়িত মানুষের লড়াইয়ের কথা, জাতি-বর্ণ ব্যবস্থা-মনুবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের কথা, উঠে আসে যাবতীয় বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে কথা, ভীমা-কোরেগাও এ দলিত জনগণের পাশে থাকা, কবি ভারভারা রাও সহ সমস্ত রাজনৈতিক বন্দির মুক্তির দাবি।

বারাসাত কলোনি মোড়ের জনবহুল পরিবেশে বক্তব্যে আর স্লোগানে স্লোগানে উঠে আসে সেই দাবি।

এ পি ডি আর নৈহাটি - জগদ্দল শাখা

মার্চ ২০২০র শেষের দিকে সারা ভারতবর্ষে যখন লকডাউন শুরু হল, তার ফলে ভাটপাড়া -কাঁকিনাড়া - জগদ্দল শিল্পাঞ্চলের শ্রমজীবি মানুষের ওপর নেমে আসে চরম আঘাত। বিশেষ করে এই অঞ্চলের অধিকাংশ মানুষ স্থানীয় জুটমিলের ওপর নির্ভরশীল। গত বছর মে মাসে লোকসভা নিবার্চনের পর কাঁকিনাড়া ও জগদ্দলের বিভিন্ন অঞ্চলে দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল বিরাট সংখ্যক মানুষ। দাঙ্গার ক্ষত মিটতেই এক বছরের মধ্যে কোভিড-১৯ এর জন্য সার্বিক লকডাউনে তাদের জীবনে নেমে আসে এক চরম অন্ধকার। এমতাবস্থায় এপিডিআর, নৈহাটি জগদ্দল শাখার সদস্যদের উদ্যোগে প্রাথমিকভাবে কাঁকিনাড়া জুটমিলের শ্রমিক লাইনের বেশ কিছু পরিবারের মধ্যে প্রথম ২৮শে মার্চ চার কিলো করে চাল পরিবার পিছু বন্টন করা হয়, এরপর ধারাবাহিকভাবে দাঙ্গাবিধবস্ত দুঃস্থ পরিবারগুলির মধ্যে আটা, ভোজ্য তেল, ছোলা, বেসম, সুজি, জ্বালানী কাঠ, জ্বালানী গুল, ঘুটে, কাঁচা সবজী, আলু, পিঁয়াজ এমনকি রমজান মাসে কলা, তরমুজও দেওয়া হয়। এছাড়াও প্রোটিন জাতীয় খাদ্য হিসাবে সোয়াবীন ও ডিম দেওয়া হয়। শ্রমিক লাইনের গরীব মহিলাদের মধ্যে স্যানিটারী ন্যাপকিনও বন্টন করা হয় ও তাদের শরীরের ওজন মাপা ও শরীরের তাপমাত্রার জন্য থার্মাল স্ক্যানিং এর ব্যবস্থা করা হয়। এতে আমাদের সদস্য ছাড়াও বিভিন্ন সামাজিক সংস্থা ও ব্যক্তি বিশেষ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। ২৮শে মার্চ যে কাজ শুরু হয়েছিল তা জুলাই এর শেষ পর্য্যন্ত চলে। ফলে বহু শ্রমজীবি পরিবার, যারা চরম দুর্গতির মধ্যে পড়েছিল তাদের কিছুটা সুরাহা হয়। অসংখ্য বিপন্ন শ্রমজীবি পরিবারের পাশে এপিডিআর তার সাধ্যমতো সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়ে তাদের বেঁচে থাকার আশ্বাস যোগায়। এছাড়াও কোভিড -১৯ এর পরিপ্রেক্ষিতে, কোভিড আক্রান্ত সাধারণ মানুষ যাতে দ্রুততার সঙ্গে সরকারী বা সরকারী অধিগৃহিত কোভিড হাসপাতালে নিঃখরচায় ভর্তি হতে পারে এবং সরকারী অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা যাতে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পায়, সে বিষয়ে শাখার তরফে উদ্যোগ নেওয়া হয়। কোভিড আক্রান্ত ভাটপাড়ার বেশ কয়েকজন রোগীকে দ্রুততার সাথে জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের নিখরচায় অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করে সরকারী ও সরকার অধিগৃহীত কোভিড হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। যখন কোভিড আক্রান্ত বিপন্ন মানুষ হাসপাতালে ভর্তির ব্যাপারে স্থানীয় প্রশাসনের কোনোরকম সহযোগিতা পাচ্ছে না, সেইসময় শাখার তরফে সরকারীস্তরে দূরভাষের মাধ্যমে যোগাযোগ করে বিপন্ন কোভিড রোগীদের সাধ্যমতো সহায়তা করা হয়েছে। ভর্তির পরও সরকার অধিগৃহীত বেসরকারী হাসপাতালে রোগীর শারীরিক অবস্থা বাড়ীর লোকজনকে না জানানোর বিষয়ে শাখা হস্তক্ষেপ করে এবং মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিককে জানিয়ে দ্রুততার সঙ্গে সেই সমস্যার সমাধান করা হয়। বেসরকারী ল্যাব সুরক্ষা কোভিড পরীক্ষার ক্ষেত্রে সরকারী নির্দেশ অমান্য করে অতিরিক্ত কালেকশান চার্জ নিচ্ছে তা ভাটপাড়া পৌরসভার পৌরপ্রধানকে মৌখিকভাবে জানানো হয়েছে এবং আগামীদিনে এই অতিরিক্ত চার্জ বন্ধ করার দাবীতে উচ্চতর কতৃপক্ষের কাছে যাবার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

এপিডিআর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা:

২১ মে এপিডিআর, জয়নগর শাখা ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা কমিটির উদ্যোগে আমফানে ক্ষতিগ্রস্ত কুলতলী ও মৈপীঠ এলাকায় তথ্যানুসন্ধান।

২৩ মে বিদ্যুৎ ও জলের দাবিতে বিডিও অফিসে সোনারপুর এলাকার বিক্ষোভরত মানুষের উপর পুলিশী লাঠিচার্জের বিরোধিতা করায় সরোজ বসু সহ ১১ জনের গ্রেপ্তার।

২৬ মে সরোজ বসু সহ সোনারপুরের ১১ জনের নি:শর্ত মুক্তির দাবিতে বারুইপুর এসপি ও এসডিও অফিসে জেলা কমিটির পক্ষ থেকে স্মারাকলিপি দেওয়া হয়।

২৬ মে এপিডিআর, জয়নগর শাখা ও দক্ষিণ পরগনা জেলা কমিটির উদ্যোগে আমফানে ক্ষতিগ্রস্ত কুলতলী ও মৈপীঠ এলাকায় দ্বিতীয় দফায় তথ্যানুসন্ধান।

৩০ মে এপিডিআর জয়নগর শাখা ও দক্ষিণ পরগনা জেলা কমিটির উদ্যোগে মৈপীঠের ভুবনেশ্বরী অঞ্চলের হালদার ঘেরিতে স্বাস্থ্য শিবির (প্রসঙ্গত: নদী বাঁধ ভাঙার ফলে এই এলাকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল নোনা জলের তলায় ছিল, দীর্ঘদিন)। সহযোগিতায়- WBDF ও SSU

৩১ মে নগেনাবাদ ও দেউলবাড়িতে পৃথক দুটি স্বাস্থ্য শিবির পরিচালিত হয়। সহযোগিতায়- WBDF ও SSU

১ জুন এপিডিআর, ডায়মন্ড হারবার শাখার উদ্যোগে সরোজ বসুসহ ১১ জনের মুক্তির দাবিতে পোস্টারিং।

২ জুন এপিডিআর, চাঁদপাড়া শাখার উদ্যোগে কুলতলী-মৈপীঠ এলাকায় মানুষের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ,

(সহযোগিতা- এপিডিআর, জয়নগর শাখা ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা কমিটি)

৪ জুন যৌথ রান্নাঘর শুরু। ডায়মন্ড হারবার এলাকার কাজীপাড়ায়। এপিডিআর, ডায়মন্ড হারবার শাখা।কোয়ারানটাইন স্টুডেন্ট ইয়ূথ নেটওয়ার্কের সহযোগিতায়।

৫ জুন সরোজ বসুসহ সোনারপুরের ১১ জনের মামলা, বারুইপুর আদালতে। ঐ দিনই তাঁদের জামিন মঞ্জুর হয়।

৬ জুন বারুইপুর জেল থেকে ছাড়া পান সরোজ বসুসহ ১১ জন। উপস্থিত ছিলেন এপিডিআর, সোনারপুর শাখা ও জেলা কমিটির সদস্যরা।

৭ জুন ডায়মন্ড হারবারে পরিচালিত রান্না ঘরের জন্য এপিডিআর, মেটিয়াবুরুজ-মহেশতলা শাখা কিছু চাল ও নগদ টাকা সাহায্য নিয়ে আসেন, পাশে দাঁড়ানোর বার্তা নিয়ে।

৮ জুন এপিডিআর ডায়মন্ড হারবার শাখার উদ্যোগে স্বাস্থ্য শিবির,

পাথর প্রতিমা থানা এলাকার মাধবপুর গ্রামে।

৯ জুন কুলতলী থানা এলাকার কৈখালীর এক আদিবাসী স্কুলছাত্রীকে দিনের পর দিন ধর্ষণ, স্থানীয় শাসক দলের ঘনিষ্ঠ এক যুবকের! কুলতলী থানায় গেলে অভিযোগ না নিয়ে ফিরিয়ে দেয়! এপিডিআর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা কমিটি উদ্যোগে বারুইপুরে পুলিশ সুপারকে ডেপুটেশন, এফআইআর গ্রহণের জন্য।

১০ জুন কুলতলী থানায় এফআইআর গৃহীত হয়। নির্যাতিতা ও তার দিদিমাকে থানায় সঙ্গে করে নিয়ে যায় জয়নগর শাখার কর্মীরা। ঐ দিনই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

১০ জুন এপিডিআর, জয়নগর শাখার ব্যবস্থাপনায় খড়গপুর আইআইটি ছাত্ররা মৈপীঠ এলাকায় কিছু ত্রাণ নিয়ে মানুষের পাশে দাঁড়ান।

১১ জুন স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার, সরিষা শাখার ম্যানেজারের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরিষার বিডিও-র কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়, ডায়মন্ড হারবার শাখার উদ্যোগে।

১২ জুন কুলতলীর নির্যাতিতার ওপর নিয়মবহির্ভূত কাজকর্মের বিরুদ্ধে বারুইপুর এসপি অফিসে স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

১২ জুন এপিডিআর, ডায়মন্ড হারবার শাখা ও দক্ষিণ ২৪ জেলা কমিটির উদ্যোগে মৌসুনী দ্বীপে কিছু খাদ্য সামগ্রী পৌঁছে দেওয়া হয় এবং স্থানীয় ফ্লাড সেন্টারে স্বাস্থ্য শিবির পরিচালিত হয়। সহযোগিতায়- WBDF ও SSU

১৩ জুন পাথর প্রতিমা থানা এলাকার দূর্গা গোবিন্দপুর শিঙ্গারপল্লী ও বনশ্যাম নগরে পৃথক দুটি স্বাস্থ্য শিবির পরিচালিত হয়। WBDF ও SSU-র সহযোগিতায়।

১৪ জুন এপিডিআর জয়নগর শাখার ব্যবস্থাপনায় ঢাকির আদিবাসী পাড়ায় যৌথ রান্নাঘর শুরু হয়।

১৬ জুন ত্রাণ দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলনরত মায়া হাউরি গ্রামের অধিবাসীদের ওপর স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যের গুন্ডামীর বিরুদ্ধে এপিডিআর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা কমিটির উদ্যোগে বকুলতলা থানায় স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

১৬ জুন এপিডিআর, জয়নগর শাখার ব্যবস্থাপনায় ঢাকির আদিবাসী পাড়ায় যৌথ রান্নাঘরের জন্য কিছু আর্থিক সাহায্য ও কিছু ওষুধপত্র নিয়ে হাজির হয় এপিডিআর, কৃষ্ণনগর শাখা ও হাওড়া সদর শাখা।

১৬ জুন এপিডিআর দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা কমিটির পক্ষ থেকে জয়নগর থানায় স্মারকলিপি দেওয়া হয়, স্থানীয় গবেষক সঞ্জয় ঘোষের অভিযোগ এফ আই আর হিসেবে গ্রহণ না করায়। ঐদিন অভিযোগ গৃহীত হয়। উপস্থিত ছিলেন

১৭ জুন এপিডিআর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা কমিটির ডেপুটশন ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার এসপি-কে।

বিষয়:বজবজের চেভিয়েট জুট মিলের শ্রমিকদের ওপর বজবজ থানার পুলিশি নির্যাতনের বিরুদ্ধে এবং বিষ্ণুপুর থানার পুলিশ সাধারণ মানুষকে যে মিথ্যে মামলায় জড়িয়ে দিচ্ছে, তার বিরুদ্ধে।

১৮ জুন এপিডিআর দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা কমিটির উদ্যোগে সুন্দরবন পুলিশ জেলার এসপি কে ডেপুটেশন।

বিষয়: ত্রাণ দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরব প্রতিবাদীদেরকে মিথ্যে মামলায় জড়ানো, ঘরছাড়া করা, ঘরবাড়ি ভাঙচুর ইত্যাদি।

সাগর কোস্টাল থানা এলাকায় এক দুর্নীতি চক্রের বিরুদ্ধে এফআইআর হলেও থানা কোন পদক্ষেপ নেয়নি, তার বিরুদ্ধে।

২০ জুন এপিডিআর, জয়নগর শাখার ব্যবস্থাপনায় সকালে স্বাস্থ্য শিবির জয়নগর এলাকার বেলে-দূর্গানগর গ্রামে।

বিকেলে কুলতলী এলাকার মধ্য পূর্ব গুড়গুড়িয়ায়।

সহযোগিতায়: বেলুড় শ্রমজীবী ও সড়বেড়িয়া শ্রমজীবী।

২১ জুন এপিডিআর, জয়নগর শাখার ব্যবস্থাপনায় বকুলতলা থানার আদিবাসী পাড়ায়।

২২ জুন এপিডিআর, সোনারপুর শাখার উদ্যোগে ক্যানিং এর ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় তথ্যানুসন্ধান।

২২ জুন মৈপীঠের আদিবাসী মুন্ডা পাড়ায় যৌথ রান্নাঘরের উদ্বোধন হয়। রান্নাঘর ৭ দিন ধরে চলে। এইদিন এলাকার মানুষের সাথে 'মানুষের অধিকার' বিষয়ে আলোচনা হয়।

২৩ জুন কুলতলী নির্যাতিতার মামলাটি বারইপুর আদালত ওঠে। উপস্থিত ছিলেন জয়নগর শাখার কর্মীরা।

২৫ জুন এপিডিআর, ডায়মন্ড হারবার শাখার উদ্যোগে মৌসুনি দ্বীপ এবং পাথরপ্রতিমার মাধবপুরে মানুষদের কিছু খাবার পৌঁছে দেওয়া হয়।

২৫ জুন কুলতলির নির্যাতিতার মামলা বারুইপুর আদালতে ওঠে। জয়নগর শাখার কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

৩ জুলাই কুলতলির নির্যাতিতার মামলা বারুইপুর আদালতে ওঠে। জয়নগর শাখার কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

৭ জুলাই ডায়মন্ড হারবার শাখার উদ্যোগে মহেশতলার বন্ধুদের সাহায্যে কিছু খাবার ইত্যাদি দেওয়া হয় নামখানা এলাকার পাতিবুনিয়া গ্রামে।

৮ জুলাই স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার সরিষা শাখার ম্যানেজারের দুর্নীতির বিরুদ্ধে ডায়মন্ড হারবার শাখা স্থানীয় প্রশাসক, সরিষার বিডিও-কে স্মারকলিপি দেয়।

তার প্রথম শুনানি ছিল। ব্যাঙ্ক ম্যানেজার না আসায় শুনানি এগোয়নি।

৯ জুলাই কুলতলির নির্যাতিতার মামলা ওঠে বারইপুর আদালতে। জয়নগর শাখার কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

১১ জুলাই হাওড়ার শিবপুর ইউনিভার্সিটির শিক্ষকদের দেওয়া গাছ ও কিছু নগদ টাকা কুলতলী মইপিট এলাকার মানুষদের কে দেওয়া হয় ব্যবস্থাপনায়: এপিডিআর, জয়নগর শাখা

১২ জুলাই আমফান রিলিফ ফান্ডের উদ্যোগে এবং এপিডিআর, জয়নগর শাখার ব্যবস্থাপনায় সংঘর্ষ বিধ্বস্ত মৈপীঠ এলাকার মানুষদের ত্রিপল ও খাদ্য সামগ্রী দেওয়া হয়।

১৩ জুলাই দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঢোলা থানা এলাকার একটা কোয়ারানটাইন সেন্টারে ধর্ষণের ঘটনায় এলাকার মানুষের মধ্যে বিক্ষোভ তৈরি হয়। সেই বিক্ষোভকে বিপদ চালিত করতে কিছু দুষ্কৃতী পুলিশের সামনেই সেন্টার ভাঙচুর করে। এই অজুহাতে পুলিশ দিগম্বরপুর গ্রাম 'যাকে পাচ্ছে তাকে তুলে নিয়ে গিয়ে মিথ্যা মামলা দিচ্ছে'- এর বিরুদ্ধে এপিডিআর' দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা কমিটি স্মারকলিপি দেয় সুন্দরবন পুলিশ জেলার এসপিকে।

১৫ জুলাই ডায়মন্ড হারবার শাখার সরিষা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরিষা বিডিও-র কাছে শুনানিতে অংশগ্রহণ।

২২ জুলাই এপিডিআর, দ:২৪পঃ জেলা কমিটির উদ্যোগে পশ্চিম বঙ্গের জেলে আটক ৭৫ জন রাজনৈতিক বন্দীসহ দেশের সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির দাবিতে মিছিল, বারুইপুরে।

২২ জুলাই দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা কমিটির উদ্যোগে স্মারকলিপি: মৈপীঠে রাজনৈতিক সংঘর্ষে ক্ষতিগ্রস্তদের স্থানীয় থানায় অভিযোগ না নেওয়ায় বিরুদ্ধে বারুইপুর এসপি-র কাছে স্মারকলিপি প্রদান।

ঐ সংঘর্ষে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণের দাবিতে বারুইপুর মহকুমাশাসককে স্মারকলিপি প্রদান।

২৭ জুলাই এপিডিআর, জয়নগর শাখার উদ্যোগে ডা: কাফিল খান, ভারভারা রাও, জিএন সাইবাবা, শারজিল ঈমাম এবং এ রাজ্যের জেলে আটক ৭৫ জনসহ সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির দাবিতে জয়নগর পৌর এলাকায় মিছিল।

৪ আগষ্ট এপিডিআর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা কমিটির উদ্যোগে বারুইপুরে পথপরিক্রমা।

দাবি:

*অবিলম্বে কাফিল খান, ভারভারা রাও, জিএন সাইবাবা, শারজিল ঈমাম এবং এ রাজ্যের জেলে বন্দি রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি।

*বাবরি মসজিদ ধ্বংসকারী সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের গ্রেফতার।

*কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে স্বায়ত্ব শাসন ফিরিয়ে দেওয়া।

*মুফতী সহ উপত্যকার সমস্ত নেতৃত্বকে মুক্তি দিতে হবে।

*সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করে উপত্যকায় গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে হবে।

৯ আগষ্ট, রবিবার সোনারপুর শাখা ও অন্যান্য কয়েকটি সংগঠনের ডাকে পশ্চিমবঙ্গে জেলে আটক ৭৫ জন রাজবন্দী সহ কাফিল খান, ভারভারা রাও, জিএন সাইবাবাদের নিঃশর্ত মুক্তি, বেসরকারি নার্সিং হোমের লাগামহীন মুনাফার বিরুদ্ধে, পরিযায়ী শ্রমিকদের ভাতা চালুর দাবিতে সোনারপুরের বৈকুণ্ঠপুর থেকে রাজপুর বাজার, হরিনাভীসহ বিভিন্ন এলাকায় শ্লোগান-গান-বক্তৃতা সহযোগে পরিক্রমা করা হয়।

১৪ আগষ্ট, শুক্রবার,

এপিডিআর, মহেশতলা -মেটিয়াবুরুজ শাখার উদ্যোগে এ রাজ্যে ৭৫জন সহ সারা দেশে প্রতিবাদীদের বন্দীদের নি:শর্ত মুক্তির দাবিতে আক্রা স্টেশন সংলগ্ন বাসস্ট্যান্ডে সভা বিকেল ৫ টায়।

১৬ আগষ্ট, রবিবার, ডায়মন্ড হারবার শাখার উদ্যোগে সকাল ৯ টায় সাইকেল মিছিল, সরিষা থেকে ডায়মন্ড হারবারে।

দাবি: করোনার অজুহাতে ডিসানসহ বেসরকারি নার্সিং হোমগুলোর লাগামহীন মুনাফা লুঠের বিরুদ্ধে এবং ভারভারা রাও, জিএন সাইবাবা, শারজিল ইমাম, কাফিল খান এবং এ রাজ্যের ৭৫ জন রাজনৈতিক বন্দীদের নি:শর্ত মুক্তি।

১৭ আগষ্ট, সোমবার এপিডিআর, গড়িয়া শাখার উদ্যোগে প্রতিবাদী মিছিল। দাবি: ডিসানসহ বেসরকারি হাসপাতালগুলোর লাগামহীন মুনাফা লুঠের বিরুদ্ধে, ডিসান হাসপাতালের মালিককে গ্রেফতার করতে হবে, বেসরকারি হাসপাতালগুলোর লুটতরাজে রাজ্য সরকারের নীরবতার বিরুদ্ধে।

হুগলি জেলা

জেলাকমিটি: লক-ডাউন এর আগে হুগলি জেলাকমিটির মাসিক সভা প্রতি মাসের প্রথম শনিবার করা হতো। লক-ডাউন পর্যায়ে প্রতি শনিবার ফোনে কনফারেন্স-কল এর ভিত্তিতে সভা হয়ে আসছিলো। এরপর দূরত্বের কথা মাথায় রেখে চুঁচুড়া, বাঁশবেড়িয়া-ত্রিবেণী ও চন্দননগর শাখার যৌথ জেলার সভা মাসে একটি সভা করার ঠিক হয়েছে। অন্যদিকে শ্রীরামপুর- উত্তরপাড়া- ডানকুনি শাখাগুলির যৌথ সভা আয়োজনের চেষ্টা চলছে।

গত ২৪শে জুন চুঁচুড়া ঘড়ির মোড়ে চুঁচুড়া, বাঁশবেড়িয়া-ত্রিবেণী ও চন্দননগর শাখার যৌথ উদ্যোগে দীর্ঘদিন পর প্রকাশ্যে সামাজিক বিশেষত কোভিড-১৯ কোরোনা পরিস্থিতিতে প্রশাসনিক ব্যর্থতা এবং আমাদের ভাবনা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দে ওয়ার জন্য পথসভা ও প্রচার পত্র বিলি করা হয়েছে।

গত ১৬ই জুলাই এ আই পি এফ এর সঙ্গে এর যৌথ উদ্যোগে প্রতিবাদী কবি ভারভারা রাওয়ের মুক্তির দাবিতে চুঁচুড়া ঘড়ির মোড়ে পথসভা করা হয়। হুগলির সংশোধনাগারে শেলী সাহার মৃত্যুর বিষয়ে সংশোধনাগারের আধিকারিক সাক্ষাৎ করতে রাজি না হওয়ায় আমরা আর টি আই পদ্ধতিতে শেলী সাহার মৃত্যুর বিষয়ে কিছু প্রশ্ন করেছিলাম। পরবর্তী সময়ে সন্তোষজনক উত্তর যথাযথ না পাওয়াতে আবার আমরা দ্বিতীয় পর্যায়ে আরটিআই করেছি।

আমরা ইতিমধ্যেই করোনা পরিস্থিতি নিয়ে হুগলি জেলার সি এম ও এইচ এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি। করোনা অতিমারীতে বিপর্যস্ত সাধারণ মানুষ। স্বাস্থ্য পরিষেবা (কোথায় টেস্টিং করা যাবে, অ্যাম্বুলেন্স, চিকিৎসক, হাসপাতালে শয্যা কিভাবে মিলবে) এই সংক্রান্ত বিষয়ে মানুষের কাছে তথ্য থাকা দরকার। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সি এম ও

এইচ আমাদের লিখিত আকারে প্রস্তাব জমা দিতে অনুরোধ জানিয়েছেন। আমরা লিখিত আকারে প্রস্তাব জমা দিয়েছি ।

চন্দননগর শাখার পক্ষ থেকে চন্দননগর পুরসভার প্রশাসক এবং প্রাক্তন পুরপিতার সাথে দেখা করে করোনা অতিমারী পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য দাবি জানানো হয়।

বাঁশবেড়িয়া-ত্রিবেণী শাখার সদস্যদের নিজেদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেয় যে কোরোনা কোভিড-১৯ অতিমারী বিষয়ে এপিডিআর এর বক্তব্য ও এবং প্রস্তাব লিখিত আকারে স্থানীয় পৌরসভা ও পঞ্চায়েতের কাছে পেশ করা এবং আলোচনা করা হবে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গত ২২শে জুলাই বাঁশবেড়িয়া পৌরসভায় প্রশাসকের কাছে এপিডিআর এর বক্তব্য জানানো হয়। এর পাশাপাশি বিভিন্ন অঞ্চলের সাধারণ মানুষের সামনে পথসভা করে এই কোভিড-১৯ সংক্রান্ত বিষয়ে এপিডিআর এর বক্তব্য সাধারণ মানুষের কাছে প্রচার করা হচ্ছে।

জুন এবং জুলাই মাসে করোনা অতিমারী পরিস্থিতিতে পরিযায়ী শ্রমিক থেকে সাধারণ মানুষের দুর্দশা এবং রাষ্ট্রের উদাসীনতা বিষয়ে সংগঠনের প্রচারপত্র এলাকায় বিলি করা হয়। এরপর করোনা অতিমারী পরিস্থিতিতে বাড়িতে থাকতে বাধ্য হওয়া নাগরিকদের ন্যূনতম স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়ার জন্য পুরসভার দায় পূরণের দাবি জানিয়ে রিষড়া, শ্রীরামপুর ও শেওড়াফুলি পুরসভায় ডেপুটেশন দেওয়া হয়। শ্রীরামপুর শাখার উদ্যোগে বর্তমান কোরোনা কোভিড-১৯ অতিমারীতে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে পুরসভা ও পঞ্চায়েত গুলিকে আতংকিত,অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়ে প্রচার পত্র নিয়ে বিভিন্ন পাড়ায় মানুষের হাতে তুলে দেওয়ার সঙ্গে প্রচারও করা হচ্ছে। সাধারণ মানুষ খুব ভালোভাবেই এই প্রচার কে ঘিরে সারা দিয়েছে। এই কঠিন সামাজিক পরিস্থিতিতে ঐক্যবদ্ধভাবে মোকাবেলা করতে হবে। চিকিৎসকদের নেতৃত্বে উপদেষ্টা কমিটি গড়ে তোলা দরকার এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক জনসচেতনতা প্রচার প্রয়োজন। যেমন স্যানিটাইজার ও হাত ধোয়ার বিষয়ে প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিতে হবে। এ বিষয়ে শ্রীরামপুর শাখা রিষড়া পৌরসভা ও শ্রীরামপুর পৌরসভায় এপিডিআর এর বক্তব্য চিঠির মাধ্যমে দেওয়া হয়েছে। রিষড়া পুরসভা এ.পি.ডি. আর এর প্রস্তাব সদর্থক ভাবে গ্রহণ করেছে এবং রূপায়ণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। ইতিমধ্যে এলাকার চিকিৎসকদের নিয়ে একটি সভায় করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করে। বাড়িতে থাকা করোনা রোগীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা , চিকিৎসকের পরামর্শ ও জরুরি সহায়তা দেবার জন্য পরিকল্পনা করা হয়েছে। স্থানীয় স্তরে সচেতনতা বৃদ্ধির ব্যাপারে প্রচারের জন্য উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। ইতিমধ্যে রিষড়া পৌরসভা সাধারণ মানুষের সুবিধার জন্য তিন জায়গায় অক্সিজেন পার্লারের ব্যবস্থা করেছে।

চুঁচুড়া শাখার দুই বর্ষীয়ান সদস্য শ্রী শ্রীধর ভট্টাচার্য গত ১৩ই জুলাই এবং শ্রী রবীন্দ্রনাথ সাহা গত ২৫শে জুলাই প্রয়াত হয়েছেন।এঁরা আজীবন মানুষের প্রতিবাদ আন্দোলন ও মানবাধিকারের পক্ষে সামিল হয়েছিলেন।

এ পি ডি আর কান্দি শাখা:

এ পি ডি আর কান্দি শাখার উদ্যোগে ২৬ শে জুলাই ২০২০ ও ২ রা আগষ্ট ২০২০ দুদিনের পথসভা হয় । বন্দীমুক্তি ও অন্যান্য দাবিতে ২৬ শে জুলাই কান্দি শাখার উদ্যোগে লিচুতলা বাজার মোড়ে পথসভা , লিফলেটিং, ও মিছিল করা হয় ।

মিথ্যা মামলায় অভিযুক্ত গৌতম নওলাখা , আনন্দ তেলতুম্বে ,ভারভারা রাও , সুধা ভরদ্বাজ , সোমা সেন , রোনা উইলসন , সুরেন্দ্র গাডলিং, অরুণ ফেরেরা, সুজান আব্রাহাম, ভারমন গনজালভেজ , শারজিল ইমাম, কাফিল খান প্রমুখ এবং পশ্চিমবঙ্গের ৭৫ জন রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তির দাবিতে এ পি ডি আর কান্দি শাখা পথসভায় সোচ্চার হয় । বক্তব্য রাখেন তারাশঙ্কর ভট্টাচার্য ও ইন্দ্রজিৎ সরকার । গান করেন কোরাস নাট্য গোষ্ঠীর সদস্য স্নেহময় ঘোষ ।

গত ২ রা আগষ্ট কান্দি শাখার উদ্যোগে জেমো-বাজার মোড়ে বন্দীমুক্তি ও অন্যান্য দাবিতে পথসভা ও লিফলেটিং হয় । বক্তব্য রাখেন ইন্দ্রজিৎ সরকার , সুবিমান বাগচি , কুণাল কান্তি সরকার , আবৃত্তি করেন কোরাস নাট্য গোষ্ঠীর সদস্য বিশ্বনাথ দে । তারপর ওই দিনই জেমো নীলু শার মোড়ে আর একটি পথসভাও করা হয়। বক্তব্য রাখেন ইন্দ্রজিৎ সরকার ।